দৃপ্ত যৌবন
সৃষ্টির ইতিহাস

দৃপ্ত যৌবন
সৃষ্টির ইতিহাস

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মীর্জা শামছুল আলম

দৃপ্ত যৌবন সৃষ্টির ইতিহাস
বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মীর্জা শামছুল আলম
০১৮১৯-১৭৫৩২১, ০১৭২৫-৮০৭২৫৮
প্রকাশকাল : অমর একুশে বইমেলা-২০২৩
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
বর্ণ বিন্যাস : ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য : ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা
আইএসবিএন:
ISBN:

DRIPTO JOUBON SRISTIR ITIHAS By Bir Muktijoddha Professor Mirza Shamsul Alam; Published by Chayyanir.Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Boimela -2023, Copy Right: Writer; Cover design: Tarunnya Tauhid & Book Setup: Chayyanir Computer, Price: TK. 350/- (Three Hundred Fifty Only) ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/ ; ফোনে অর্ডার : ০১৬১১-৯১৩২১৪

উৎসর্গ

টিপু সুলতান
জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি
কাজী নজরুল ইসলাম
কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
আমার জীবন সঙ্গিনী
বই লেখায় সহযোগিতাদায়িনী
সহধর্মিণী নাজমা সুলতানা ঝর্ণা
ও
আমার আদর স্নেহের মেয়ে
মীর্জা শামীমা সুলতানা তাঞ্জিল

ভূমিকা

দৃপ্ত যৌবন সৃষ্টির ইতিহাস, যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়। পৃথিবীর প্রিয় নবী বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (স.) নবীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর রহমতে দৃপ্ত অলৌকিক শক্তির মাঝে অনেক ধর্ম যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন মানুষের নবী, মানবতার নবী। সারা দুজাহানের নবী।
লেখক, কবি, সাহিত্যিক, যোদ্ধা, গায়ক, নায়ক, শিল্পী, অভিনেতা, অভিনেত্রী, জাহাজ চালক, উড়ো জাহাজ চালক, আর্মি, বিজিবি, পুলিশ, র‍্যাব বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজসেবক, দেশপ্রেমিক, রাজনীতিবিদ, ধার্মিক আলেম, ওলেমা, ব্যবসায়ী, আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক জয় পরাজয়, বিজয়, অভিযান, প্রতিভার বিকাশ, সম্রাট, রাজা, প্রজা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের বাংলার মুক্তিযুদ্ধ। দুনিয়ার মানুষের মূল্যবান সময় যৌবন দৃপ্ত শক্তি। বাংলার প্রথম মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমেদসহ সকল মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা উন্নয়নের পতাকা যার হাতে। মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ সকল প্রধানমন্ত্রী। মাননীয় এমপি, সম্মানিত সিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, পৌরসভার চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার, মহিলা মেম্বার, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানগণ রাষ্ট্রের সকল সরকারি, বেসরকারি কর্মচারী, আঠার হাজার মাকলুকাত, পশু, পাখি, জীব, জানোয়ার সকলেই দৃপ্ত যৌবন শক্তির ফসল। পৃথিবী সুন্দর হয় অম্লান যৌবন শক্তির মাধ্যমে। আমার লেখা বই পাঠক হৃদয়ে কতটুকু সমাদৃত হবে জানি না অনেক ভুলক্রুটি আছে। ইতোমধ্যেই আমার লেখা আরো দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। (১) আমার মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো, (২) বন্দি খাঁচার বুলি। বই দুটি পাঠক মনে স্থান পেয়েছে। হাজার হাজার কপি পাঠকদের হাতে পৌঁছেছে। সৎকর্মে মানবতার সেবায় দৃপ্ত যৌবন শক্তিকে লালন করতে হবে পালন করতে হবে। আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ। মানুষকে সুন্দর সঠিক পথে চলতে হবে। দৃপ্ত যৌবন সৃষ্টির ইতিহাস এ পৃথিবীকে সুন্দর করতে অনন্তকাল অম্লান যৌবন আশীষ তোমায়।

সূচি

১. ঐতিহাসিক ছয় দফা # ০৯
২. মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় # ১২
৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ামক শক্তি # ১৩
৪. পলাশীর যুদ্ধ # ১৪
৫. মহাত্মা গান্ধীর সাথে ইংরেজদের বিরোধ # ১৭
৬. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ইংরেজ শাসন আরম্ভ # ১৮
৭. ইংরেজদের বিরুদ্ধে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর যুদ্ধ # ১৯
৮. ইংরেজদের বিরুদ্ধে শহিদ তিতুমীরের যুদ্ধ # ২৩
৯. ইংরেজদের সাথে টিপু সুলতানের যুদ্ধ # ২৬
১০. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ # ২৮
১১. দৃপ্ত যৌবনে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবে জীবন দান # ৩২
১২. ভারত ছাড়ো আন্দোলন # ৩৩
১৩. ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তরে মাউন্ট ব্যাটন পরিকল্পনা # ৩৪
১৪. লক্ষ লক্ষ জীবনের প্রতিদানে স্বাধীন ভারতবর্ষ # ৩৪
১৫. গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান # ৩৫
১৬. ভারতবর্ষে তৈমুর লঙ্গ এর আক্রমণ (১৩৯৮-৯৯খ্রি.) # ৩৯
১৭. মহারাজা অশোক (২৭৩-২৩৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) # ৪১
১৮. সম্রাট অশোকের ঐতিহাসিক কলিঙ্গ যুদ্ধ # ৪২
১৯. ইসলামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক খন্দকের যুদ্ধ # ৪৭
২০. মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের সাথে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ # ৪৯
২১. সুলতানা রাজিয়া # ৫০
২২. ঐতিহাসিক নাম নূরজাহান # ৫২
২৩. বিদ্যোৎসাহী সুলতান মাহমুদ # ৫৩
২৪. সম্রাট শাহ্‌জাহানের নির্মিত কালজয়ী তাজমহল # ৫৪
২৫. ঈসা খান মানসিংহ যুদ্ধ # ৫৫
২৬. বাংলার বজ্রকণ্ঠ # ৫৬
২৭. ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ # ৫৮
২৮. বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর বিদায় হজের ভাষণ # ৬৩

ঐতিহাসিক ছয় দফা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৬৬খ্রি. ফেব্রুয়ারি লাহোর বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে ছয় দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ :

প্রথম দফা :

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে। পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে যুক্তরাষ্ট্রীয়। যেমন:

ক. পাকিস্তানের সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির।

খ. সর্বজনীন প্রাপ্ত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলো গঠিত হবে।

গ. সংবিধানে জনগণের পূর্ণ মৌলিক অধিকার রক্ষিত হবে।

দ্বিতীয় দফা :

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাছে কেবল দুটি বিষয়ে ক্ষমতা থাকবে (১) দেশরক্ষা, (২) পররাষ্ট্র। অবশিষ্ট সব বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

তৃতীয় দফা :

দু' অঞ্চলের জন্য দু'টি ভিন্ন রকম মুদ্রাব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়।

ক. স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রা পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে।

খ. দু' অঞ্চলের জন্য দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি পৃথক রাজস্ব ও আর্থিক নীতি গৃহীত হবে।

চতুর্থ দফা :

কর ও শুল্ক ধার্যের ক্ষমতা প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত অর্থের একটা নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে।

পঞ্চম দফা :

ক. যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের বহির্বাণিজ্যের জন্য পৃথক হিসাব রক্ষা করা হবে।

খ. বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলোর অধীনে থাকবে।

গ. কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অঙ্গরাজ্যগুলো মেটাবে।

ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য সম্পর্কে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলো আলাপ আলোচনা ও চুক্তি করতে পারবে।

ঙ. কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে অঙ্গরাজ্যগুলো বিদেশে স্ব স্ব বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

ষষ্ঠ দফা :

নিজেদের আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধাসামরিক বাহিনী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের সুযোগ ও ক্ষমতা দিতে হবে।

ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব :

বাংলার মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি সুচিন্তিত বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী।

১। **বাঙালির প্রাণের দাবি :** বাংলার মানুষ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের শোষণ-নির্যাতনে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। বাংলার মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাঁচার দাবী নিয়ে ছয় দফা কর্মসূচী পেশ করেন।

২। **জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক :** গুরুত্ব সম্পর্কে শেখ মুজিব নিজেই বলেছিলেন, "ছয় দফা কর্মসূচী বাংলার কৃষক, মজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা আপামর জনসাধারণের মুক্তির সনদ।"

৩। **জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ :** ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে।

৪। **স্বায়ত্তশাসনের দাবি :** পূর্ব পাকিস্তানকে একটি পৃথক অঞ্চল হিসাবে ছয় দফায় পেশ করা হয়।

৫। **আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দারুণভাবে বেড়ে যায়।

৬। **স্বাধীনতা আন্দোলন :** ছয় দফা আন্দোলনেই স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

৭। **ম্যাগনাকার্টা :** ছয় দফাকে ব্রিটেনের গণতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন ম্যাগনাকার্টা অধিকার দিল। তাই ছয় দফাকে ম্যাগনাকার্টার সাথে তুলনা করা যুক্তিযুক্ত। বাংলার স্বাধীনতার দলিল।

ছাত্র সমাজের ঐতিহাসিক ১১ দফা :

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্কান্দার মির্জার সামরিক আইন জারি এবং পরবর্তীকালে আইয়ুব খানের স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে বাঙালি জনগণ চুপ করে বসে রইল না। বিশেষ করে ছাত্র সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। **১৯৬৮-৬৯** খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলন চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে। **১৯৬৯** খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি ডাকসু কার্যালয়ে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ **১১** দফা দাবি নিয়ে গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেয়। ছাত্র সমাজের **১১** দফা কর্মসূচী নিম্নরূপ:

১। এ দফায় শিক্ষা সমস্যার প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ:

ক. প্রাদেশিকীকরণ কলেজগুলোকে (জগন্নাথ কলেজ ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজসহ) পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া।

খ. স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

গ. সরকারি কলেজগুলোতে নৈশ বিভাগ চালু করা।

ঘ. ছাত্র বেতন শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাস করা।

ঙ. ছাত্রাবাসগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারি সাহায্য প্রদান করা।

চ. শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ও অফিসে বাংলা ভাষার প্রচলন করা।

ছ. শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা।

জ. অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা।

ঝ. চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা।

ঞ. বহুমুখী কারিগরি শিক্ষা এবং ছাত্রদের হ্রাসকৃত পাঠ্যক্রমে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জনের সুযোগ দান করা।

ট. অল্প ভাড়ায় ট্রেন ও বাসে ভ্রমণের সুযোগ দান করা।

ঠ. চাকরির সুযোগের নিশ্চয়তা দান করা।

ড. **১৯৬১** খ্রিস্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ প্রত্যাহার করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দান।

২। প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

৩। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করা হয়।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করা।

৫। ব্যাংক, বিমা, পাট ব্যবসাসহ সকল বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ।

৬। কৃষকদের কর ও খাজনা হ্রাস করে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ৪০ টাকা ও চালের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস প্রদান শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালা-কানুন প্রত্যাহার ও শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার প্রদান করা।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বনজ সম্পদের উন্নতি করা।

৯। নিরাপত্তা আইন, জরুরী আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করা।

১০। সিয়াটো, সেন্টো পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং জোটবহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ।

১১। সব রাজবন্দির মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা মিথ্যা মামলাসহ সব রাজনৈতিক মামলা বাতিল ঘোষণা করা।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার গুরুত্ব :

পাকিস্তানের রাজনীতিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের **১১** দফা কর্মসূচি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

১১ দফা আন্দোলন রূপ নেয় গণমানুষের আন্দোলনে। ছাত্র সমাজের **১১** দফা কর্মসূচীর প্রথম দফা ছিল কুখ্যাত হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল। ছাত্র সমাজের **১১** দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে গভর্নর টিক্কা খানের ঘাতক পাক-হানাদার সৈন্যরা **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ গভীর রাতে নিরীহ, নিরস্ত্র, অসহায় বাংলার মানুষদের উপর ট্যাংক, মেশিনগান, মর্টারসহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন,

পিলখানার ইপিআর হেড কোয়ার্টার, ঢাকার বিভিন্ন স্থান, পত্রিকা অফিসসমূহ সকল স্থানে তাদের উন্মুক্ত ও নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালায়। ওই দিন নারকীয় হত্যাকাণ্ডে প্রায় ৫০ হাজার বাংলার মানুষ নিহত হয়। পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এ হত্যাযজ্ঞের নির্দেশ দিয়ে ২৫ মার্চ রাতেই ঢাকা ত্যাগ করেন। নিরীহ, নিরস্ত্র, ঘুমন্ত সাধারণ মানুষদের উপর অতর্কিতে হামলা চালানো ও নারকীয় হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ গণহত্যার নামকরণ করেছিল “অপারেশন সার্চলাইট”। ২৫ মার্চকে ইতিহাসে কাল রাত্রি হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। ঐ দিন রাতেই বঙ্গবন্ধু জাতির মুক্তির লক্ষ্যে হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘোষণা দেন যা ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ামক শক্তি

মুক্তিবাহিনী এবং মিত্র বাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। এ স্বাধীনতা এসেছে বাংলার মানুষের বহু ত্যাগ তিতিক্ষা, ৩০ লাখ শহিদের রক্ত, দু'লাখ নারীর সম্ভ্রম ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে। তাই মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় ইন্দিরা গান্ধী, বিচারপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রচেষ্টা বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতা, সেনাবাহিনী, সর্বোপরি মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে শুরু করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের বহু ঘটনা ও কার্যক্রম যুদ্ধের নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে, অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা (অনূদিত) দেন। “ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছো, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্ব শক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও। (শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ ১৯৭১)।

স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সবস্থানে তদানীন্তন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এই ঘোষণাটি ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ হান্নান চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

পলাশীর যুদ্ধ

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ ও ইস্ট ইন্ডিয়া ইংরেজ কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা :

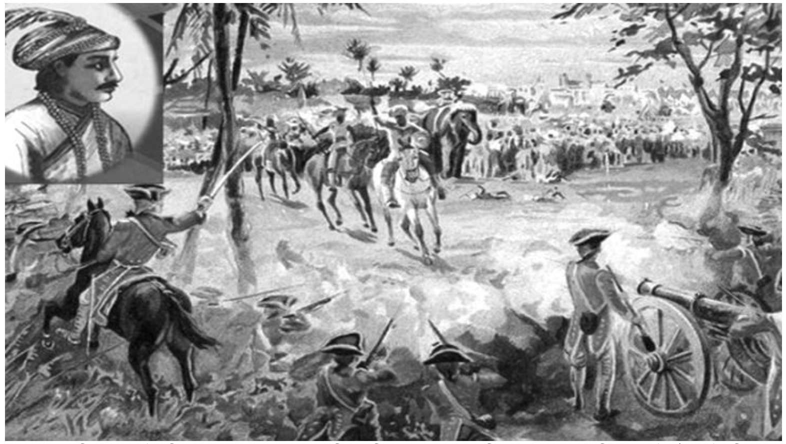

‘বাংলা বিহার উরিষ্যার মহান অধিপতি দাদু তুমি না বলেছিলে ইস্ট ইন্ডিয়া ইংরেজ কোম্পানিকে এ দেশে প্রশ্রয় দিও না। সুযোগ পেলেই তারা এ দেশ কেড়ে নেবে। আমি বেঁচে থাকতে ইংরেজদের এ দেশে প্রশ্রয় দেব না। তারা এদেশে দুর্গ তৈরী করতে পারবে না।’

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু হলে তার দৌহিত্র (নাতী) সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করেন। নবাব আলীবদী খানের মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলা, বিহার উরিষ্যার নবাব মনোনীত করে যান। আলীবদী খান তার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে নবাব হিসাবে মনোনীত করার পর অন্যান্য জামাতা ও দৌহিত্র গণ বিশেষ করে শওকত জং এর বিরোধিতা করে। তার সাথে যোগ দেন সিরাজের আপন খালা ঘসেটি বেগম ও দেওয়ান রাজা রাজবল্লব, ইয়ার লতিফ, রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ উমি চাঁদ প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারীগণ। এদিকে উত্তরাধিকারী দ্বন্দ্বের সুযোগে ইংরেজ বণিকগণ সিরাজউদ্দৌলার বিরোধী খালা ঘসেটি বেগমের সাথে হাত মেলায়। পারিবারিক ষড়যন্ত্র সিরাজ কৌশলে দমন করলেও বাহিরে ষড়যন্ত্রের আর এক জাল বিস্তৃত হতে থাকে। এ ষড়যন্ত্রে জড়িত হয় দেশি-বিদেশি বণিক শ্রেণি, নবাবের দরবারের প্রভাবশালী রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণি ঘুষখোর কর্মচারী, নবাবের সেনাপতি মীরজাফরসহ আরো অনেকে। ইংরেজরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলা তথা

ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালাতে শুরু করে। তারা নানা অজুহাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় যার চূড়ান্ত রূপ নেয় গঙ্গা তীরে আম বাগানের পলাশীর যুদ্ধে। ষড়যন্ত্রকারীরা নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করতে যখন সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত, তখন ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ অতি সামান্য অজুহাতে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইংরেজ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইংরেজদের প্রতারণা ও বিশ্বাস ঘাতকতার সংবাদ পেয়ে তিনি পূর্বেই পলাশীর প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে ভারতের ইতিহাসের এ যুগান্তকারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভের চক্রান্তে নবাবের সেনাবাহিনীর এক বিশাল অংশ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। মীরজাফরের নির্দেশে সিরাজের সৈন্যরা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

নবাবের বীর সেনা মোহনলাল ও মীর মদনের অধীনে অল্প সংখ্যক সেনা নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকে। মীর মদন ও মোহন লালের সমর কৌশলতার সম্মুখে ইংরেজ বাহিনী দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারেনি। ফলে পার্শ্ববর্তী আমবাগানে ক্লাইভ তার সেনাবাহিনীকে অপসারণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু হঠাৎ আকস্মিক গোলার আঘাতে মীর মদনের মৃত্যু ঘটলে মোহন লাল ও ফরাসি সেনা সিনফ্রে যুদ্ধ চালাতে থাকেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নবাব আলীবর্দী খানের আমলে তার আনুগত্যপূর্ণ ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপস্থিত বিপদে সাহায্য কামনা করেন। সিরাজ হাত জোড় করে বলেন, "বিপদে আপনজন জেনে বুকে ভরসা নিয়ে যার কাছে দাঁড়ানো যায় সেই তো আত্মীয়, আপনি শুধু সিপাহশালার নন আপনি আমার আত্মীয় আমাকে সাহায্য করেন।" মীরজাফর মুখে সাহায্যের কথা বলে নবাবকে যুদ্ধ বন্ধের পরামর্শ দেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা সরল বিশ্বাসে তার পরামর্শ মেনে নিয়ে যুদ্ধ বন্ধের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু তখনো মোহনলাল ও সিনফ্রের চেষ্টায় যুদ্ধ সিরাজের পক্ষে অনুকূলে ছিল। নবাবের রণ ক্লান্ত সৈন্যরা যখন বিশ্রামরত ঠিক তখনই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের ইঙ্গিতে ইংরেজ সেনারা নবাবের সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে নবাব বাহিনীর পরাজয় ঘটে। হতভাগ্য সিরাজ মুর্শিদাবাদে গিয়ে পুনরায় সেনা সংগ্রহের বৃথা চেষ্টা করে অবশেষে প্রাসাদ থেকে কন্যা উম্মে জহুরা, স্ত্রী লুৎফা, একজন বিশ্বস্ত প্রহরিকে সাথে নিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। কিন্তু পথিমধ্যে ভাগীরথী নদীর পারে ভগমানগুলায়

খিচুরি আনার সময় মীর কাশেম মীরজাফরের জামাতার সৈন্যরা তাকে বন্দি করে স্ত্রী লুৎফা ও কন্যা উম্মে জহুরাকে ছিনিয়ে নেয়। বন্দি সিরাজকে মুর্শিদাবাদে এনে মীর জাফরের সামনে হাজির করলে তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পরে মীরজাফরের পুত্র মিরনের আদেশে অর্থলোভী ঘাতক মহম্মদী বেগ অন্ধকুঠুরিতে বন্দি নামাজে শিজদা দেওয়ার সময় পিছন দিক থেকে ছুরিকাঘাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে। এই ঘাতক মহম্মদী বেগ জীবিত অবস্থায় নবাবের কাছ থেকে অনেক অর্থ বিভিন্ন সময় সাহায্য নিয়েছে। মৃত্যুর সময় নবাব বলেছিলেন, "আমি শুধু বাংলার নবাবই ছিলাম না, আমি একজন মানুষও ছিলাম, মানুষ হিসাবে ওরা আমাকে বাঁচতে দিল না, হায়রে অভাগা দেশ।" শির মস্তক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো। জয়লাল আবদিন নামে এক ব্যক্তি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের দেহ ডাস্টবিন থেকে তুলে নিয়ে কবর দিলেন।

এ ভাবেই পলাশীর প্রান্তরে দেশপ্রেমের পরাজয় ঘটে বিশ্বাসঘাতকতার জয় হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পূর্ণ করায়ত্ত দখল হয়? দক্ষিণ ভারতে টিপু সুলতানকে পরাজিত করে তারা মহীশুর রাজ্য দখল করে। বীর টিপু সুলতান যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধরত অবস্থায় মারা যান। এভাবে একে একে সমগ্র ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ইংরেজ শাসন শোষণ আধিপত্য শুরু হয়।

মহাত্মা গান্ধীর সাথে ইংরেজদের বিরোধ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর বর্তমান গুজরাটের অন্তর্গত সমুদ্র তীরবর্তী কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। আত্মার উদারতার জন্যই তিনি ' 'মহাত্মা" নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা। দক্ষিণ ভারতের গুজরাটের একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নিজ মেধা ও দর্শনের মাধ্যমে ভারতের জাতীয় নেতায় পরিণত হন। তিনি লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মজীবন শুরু করেন এবং সেখানে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এরপর দেশে ফিরে ইংরেজ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন যা অসহযোগ অহিংস ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন নামে পরিচিত। ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অনন্য অবদানের জন্য তিনি ভারতের জাতির পিতা হিসেবে সম্মানিত। এ মহান নেতা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি নথুরাম গডসে নামক আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

পলাশীর আম্রকাননে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফর রাজা রাজবল্লব ইয়ার লতিফ, রায় দুর্লভ, উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ, খালা ঘসেটি বেগম গংদের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত হলে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন আরম্ভ হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ইংরেজ শাসন আরম্ভ

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারত থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সরাসরি ইংরেজ সরকার ভারত শাসনের দায়িত্ব হাতে নেয় যা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিরাজমান ছিল।

ব্রিটিশদের প্রায় দুইশত বৎসর শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ শাসন শোষণ, অত্যাচার আর নিপীড়নের নাগপাশে আবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন প্রহসনমূলক আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশরা এ উপমহাদেশে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে পাকাপে াক্ত করে। এ দুইশত বছরে উপমহাদেশের জনগণ ব্রিটিশ বেনিয়া চক্রের শোষণ আর নির্যাতনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। নীলকরদের অত্যাচার, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নীতি, জবরদস্তিমূলক খাজনা আদায়, ব্রিটিশদের ভাগ কর ও শাসন কর নীতি ইত্যাদি শত শত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের অন্যায় অত্যাচারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর যুদ্ধ

মুক্তিকামী ভারতের বিক্ষুব্ধ তারুণ্যের প্রতীক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে ভারতবর্ষকে যিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই সিপাহশালার নাম সুভাষ চন্দ্র বসু। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি উড়িষ্যার কটক শহরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন আইনজীবী এবং মা প্রভাবতী দেবী। সুভাষ চন্দ্র বসুর শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয় কটক শহরের সাহেবী প্রোটেস্টান্ট স্কুলে। পরে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেনী মাধব দাসের দ্বারা বিপ্লবী জীবনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন তিনি। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। মুক্তিপথের ব্যাকুল চিত্ত সুভাষ চন্দ্র বসুকে শ্রী রাম কৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী গভীরভাবে উদ্দীপ্ত করতো। ফলে তিনি গৃহ ত্যাগ করে কিছুকাল হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং যোগী সন্ন্যাসীদের মতো জীবন যাপন করেন। পরে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং নতুন করে জীবন শুরু করেন।

বাল্যকাল থেকেই সুভাষ চন্দ্র বসুর অন্তরে দেশপ্রেমের আগুন প্রজ্বলিত হয়। এ সময়ে (তাঁর কলেজে পড়ার সময়) ওটেন নামের জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালি জাতি সম্পর্কে অপমানজনক উক্তি করায় তার মুখের উপর জোরালো প্রতিবাদ করেন। এতে তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার হতে হয়। পরে স্যার আশুতোষের সহায়তায় সুভাষ চন্দ্র বসুকে ব্রিটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি করা হয়।

সেখান থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বি.এ পাশ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেতে গমন করেন।

বিলেতে গিয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে আই.সি.এস পাশ করেন। পরে মর‍্যাল সায়েন্সে কেম্ব্রিজে ট্রাইপস লাভ করেন। দেশে ফিরে মহাত্মা গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে সিভিল সার্ভিসের চাকরি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজি তাকে চিত্তরঞ্জন দাসের পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে নির্দেশ দেন। এরপর তিনি গোলামীর সমস্ত প্রলোভন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে যোগ দেন।

সুভাষ চন্দ্র বসুর কর্মজীবন ছিলো ঘটনাবহুল রূপ কথার কাহিনির মতোই রোমাঞ্চকর।

কিছুকাল তিনি কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের সম্পাদক ও জাতীয় কংগ্রেসের অধ্যক্ষ ছিলেন। এরপর শুরু হয় বিপ্লবী জীবন। ইংল্যান্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ এর ভারত আগমন উপলক্ষে সারা ভারতে যে হরতাল আহ্বান করা হয়, তিনি তার মূল হোতা ছিলেন বলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি লাভের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ফরোয়ার্ড পত্রিকার ব্যবস্থাপক ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। এরপর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কর্পোরেশন গঠিত হলে তার প্রথম মেয়র হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিযুক্ত হন সুভাষ চন্দ্র বসু। তিনি কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হয়েই স্বরাজ পার্টির মূলনীতি ঘোষণা করেন। এই দলের মূল লক্ষ্য ছিলো ইংরেজকে বিতাড়িত করে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন।

এই নীতি ঘোষিত হওয়ার পরেই জঙ্গি জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে দলের অন্যান্য কর্মীসহ গ্রেপ্তার হন সুভাষ চন্দ্র বসু। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও পুনরায় তাঁকে কারা বরণ করতে হয়।

কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর মুক্তির দাবীতে স্লোগানে ফেঁটে পরে ভারতবর্ষের মানুষ। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ সুভাষ চন্দ্র বসু মুক্তি পান। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি ত্রিপুরা কংগ্রেসের সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন।

জওহর লাল নেহেরু স্বায়ত্তশাসনের দাবী করলে সুভাষ চন্দ্র বসু বলেন, “পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে যাক”। তিনি স্ব-গর্জনে বলে উঠলেন, “তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব”। আর

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি তখন রক্ত আরো দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশা আল্লাহ।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় সুভাষ চন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু দক্ষিণ পন্থীদের বিরোধিতার মুখে পদত্যাগ করেন। তিনি সে বছরই ফরোয়ার্ড ব্লক নামে নতুন দল গঠন করেন। তিনি স্বাধীনতার জন্য সোচ্চার হলেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আবার গ্রেপ্তার হলেন তিনি। তবে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য কারাগারে না পাঠিয়ে তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হলো। এ অবস্থায় তিনি একদিন প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে পেশোয়ার এবং কাবুল হয়ে বার্লিন চলে আসেন। সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে চলে যান (সাবমেরিনে চড়ে) এবং দেশের বাইরে থেকে ব্রিটিশদের উপর আঘাত হানবার পরিকল্পনা করেন। দেশের ভেতরে থাকলো তাঁর অগণিত সহকর্মী। সিঙ্গাপুরে গঠিত হলো "আজাদ হিন্দ ফৌজ"। বাংলার দামাল ছেলে সুভাষ চন্দ্র বসু তাঁর সর্বাধিনায়ক হলেন। সে দিন থেকে তিনি "নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু" নামে সুপরিচিত হলেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি জাপানি আক্রমণে সিঙ্গাপুরের পতন হলো। সেখানে ধুরন্ধর ইংরেজরা ৩২,০০০ ভারতীয় সৈন্যকে জাপানিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ইংরেজ সেনাপতি পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। কিন্তু জাপানিরা এই নিরপরাধ ভারতীয় সৈন্যদের বন্দী করেনি। পরে এই ৩২ হাজার সৈন্যই তাদের দলনায়ক মোহন সিংহের নেতৃত্বে ভারত দখল করার লক্ষ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। সেই সময়ে জাপানে অবস্থান করছিলেন বিপ্লবী, রাস বিহারী বসু। আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের সংবাদ পেয়ে তিনি এই বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করে গঠন করেন স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার। নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ সিঙ্গাপুর থেকে এসে বার্মার আরাকানে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু জাপানিদের হাতে আন্দামানের পতন ঘটলে জাপান সরকার আন্দামানকে ছেড়ে দেন সুভাষ চন্দ্র বসুর জিম্মায়। এই আন্দামানেই স্বাধীন ভারতের বিজয় পতাকা প্রথম উড্ডীন হয়। নেতাজি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি রেঙ্গুন থেকে ভারত আক্রমণের হুকুম দিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ বার্মা সীমান্ত পার হয়ে ১৮ মার্চ ভারতের মনিপুরে প্রবেশ করে এবং ইন্‌ফল ও কোহিমার খানিকটা অংশ দখল করে নেয়। জাপান বিশ্বাসঘাতকতা করে। জাপান চাচ্ছিল ভারত জাপানিদের দখলে আসুক। সুভাষ চন্দ্র বসু চাইলেন ইংরেজরা চলে যাবার পর ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে

প্রতিষ্ঠা পাবে। জাপান খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিলো। ফলে সমর ক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের শত শত সেনা না খেয়ে রোগে শোকে মারা যেতে লাগলো। এমনকি কেউ কেউ আত্মহত্যা করলো। এর পর শুরু হলো ইংরেজদের বোমা বর্ষণ। ইংরেজরা কয়েকবার গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে হত্যার পরিকল্পনা করেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজ এর একজন কুখ্যাত লেফটেন্যান্ট বিশ্বাস ঘাতকতা করে বসে। সে পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের দলে যোগ দেয়। ইংরেজদের কাছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ঘাঁটি এবং অবস্থানের খবর বলে দেয়। ঘাঁটির সঠিক সন্ধান পেয়ে ইংরেজরা তাঁদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু পিছু হটতে বাধ্য হন।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলে মিত্র বাহিনীর হাতে মার খেয়ে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল জাপানিরা সিঙ্গাপুর ছেড়ে পালালো। ফলে ভারতীয় শেষ বাহিনীর হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সিঙ্গাপুর থেকে পালালেন। তিনি জাপানি বিমানে সিঙ্গাপুর থেকে এসে করমোজার তাইকু বিমান বন্দরে এসে নামলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফৌজের স্টাফ অফিসার হাবিবুর রহমান। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু তাইকু থেকে টোকিওর উদ্দেশ্যে রওনা হন। যতদূর জানা যায় এই বিমান যাত্রায় বিমানে বিস্ফোরণ ঘটে এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেন। তবে তাঁর মৃত্যু নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন তিনি হাসপাতালেই মারা যান। কেউ বলে আহত অবস্থায় তিনি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যান এবং আজও নিরুদ্দেশ আছেন। ভারতের এই প্রাণপ্রিয় নেতা এখনো তাদের মনে গৌরবের আসনে আসীন স্বাধীনচেতা, সত্যনিষ্ঠ, দুঃসাহসী, নির্ভীক ও মহান দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি খ্যাত ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ প্রতিবাদী। তাঁর লেখা দু'টি স্মরণীয় বই রয়েছে। (১) তরুণের স্বপ্ন এবং ইংরজিতে লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২) 'An Indian pilignim'. "দেশপ্রেমের মৃত্যু নাই"।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে শহিদ তিতুমীরের যুদ্ধ

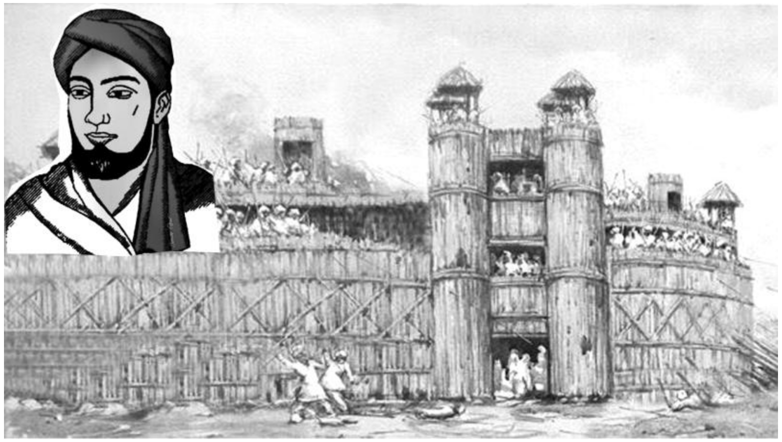

"তিতুমীর তোমার দৃপ্ত ঈমানে আমরা যে বলীয়ান, বুকের তাজা রক্ত দিয়েও রাখবো দেশের মান"। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জখমাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত এ দেশকে মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে বিদ্রোহ করলেন যে অমিয়তেজী বীর সিংহ পুরুষ, তাঁর প্রকৃত নাম সায়্যিদ মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। তিনি ১৭৮২খ্রি. পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বশির হাট মহকুমার চাঁদপুর (মতান্তরে হায়দারপুর) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর হাসান আলী। মায়ের নাম আবিদা রোকাইয়া খাতুন। শৈশবেই পিতৃহীন হয়ে দাদার আদরে লালিত পালিত হন তিতুমীর।

পাঁচ বৎসর বয়সে স্থানীয় মক্তবে তিনি ভর্তি হন। জনৈক স্বাধীনচেতা শিক্ষকের সাহচর্য লাভ করে তিনি রাজনীতি ও মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন হন। তাঁর শিক্ষার ফলে তিতুমীরের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জন্ম লাভ করে। ইসলামি পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা তাঁর মনকে প্লাবিত করে। যুবক তিতুমীর স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। হজ পালন করার জন্য মক্কা গেলে সেখানে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত অগ্নিপুরুষ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সাহচর্য লাভ করেন। বেরেলভীর আদর্শ তাঁকে অনুপ্রেরণা দান করে। কয়েক বৎসর তাঁর সঙ্গে কাটানোর পর কোলকাতায় ফিরে আসেন। ইংরেজ সরকার মুসলমানদের উপর অত্যাচারের

স্টিম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানেরা হৃত সর্বস্ব। খাওয়া-পড়া, চিকিৎসা বাসস্থানের সামান্য সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত। ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের উপর শোষণ করছে, অন্যদিকে এক শ্রেণির বর্ণ হিন্দুদের উপর তোষণ এই দ্বিমুখী নীতি চালাচ্ছে। এতে করে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ দিন দিন বেড়ে চলেছে। মুসলমান শ্রমিক কৃষক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তিতুমীর ইসলামী আদর্শকে সামনে রেখে এক বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মসূচী নিলেন। বাঙালি কৃষক মজুরসহ মেহনতি মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করতে থাকেন। তিনি বললেন, "হে ভাইয়েরা মুসলমানগণ এক আল্লাহর গোলামী ছাড়া আর কারও গোলামী করবে না। আমরা আমাদের হৃত গৌরব ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে যাবো।" কিশোর-যুবকসহ শত শত মানুষ সমবেত হলো তিতুমীরের ডাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার সংকল্প নিয়ে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সেনানায়ক সিপাহশালার সায়্যিদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর নারকেলবাড়িয়ায় একটি মজবুত বাঁশের কেল্লা তৈরী করলেন তাঁর বিপ্লবী বাহিনী দিয়ে।

এদিকে তিতুমীরের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদাররা ভীত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। স্থানীয় জমিদারদের নিজস্ব যে লাঠিয়াল বাহিনী ছিলো তার উপরও তারা আর ভরসা করতে পারছিলেন না। তাই বাঁচার তাগিদে তারা ইংরেজ শক্তির শরণাপন্ন হলেন। গোবরডাঙ্গার জমিদার কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলো মোল্লাহাটের ইংরেজ কুঠিয়াল ডেভিসের সঙ্গে। জমিদার ও ইংরেজদের স্বার্থ এক ছিলো। তাই ডেভিসও প্রজাবিদ্রোহ দমনে এগিয়ে এলেন। তিনি কয়েক শত সৈন্য নিয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। কিন্তু তারা তিতুমীরের মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন। আরেক যুদ্ধে তিতুমীরের মুজাহিত বাহিনীর হাতে নিহত হলেন গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়। এরপর তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন বারাসাতের কালেক্টর আলেকজান্ডার। তিনি বশির হাটের দারোগাকে সাথে নিয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজেই পরাজিত ও নিহত হন।

ইংরেজ সাম্রাজ্যলোভীদের বিরুদ্ধে এ এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এতে ইংরেজ সরকারের টনক নড়লো গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিং তিতুমীরের মোকাবিলা করার জন্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টি-এর নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী

পাঠালেন। স্টুয়ার্ট তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে বাঁশের কেল্লা অবরোধ করলেন। স্টুয়ার্ট ঘোষণার মাধ্যমে তিতুমীরের উদ্দেশ্যে কিছু লোভনীয় বাণী শোনালেন। তিনি বললেন "তিতুমীর তুমি যদি ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ না করো তবে অনেক পুরস্কার দেয়া হবে"। নির্ভীক তিতুমীর প্রলোভনে কান দিলেন না। রাতের আঁধারে ইংরেজ বাহিনী আকস্মিকভাবে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায় সুগঠিত বাহিনী আক্রমণ করে বসলো। কিন্তু তিতুমীরের অনুসারী সৈন্যরা ক্ষিপ্রগতিতে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলো। প্রচণ্ড বীরত্ব প্রদর্শন করে তাঁরা ইংরেজদের হতাহত করতে লাগলো। কুটিল বুদ্ধির স্টুয়ার্ট হঠাৎ করে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। ইসলামের বীর সৈনিক বাঙালি মুসলিম সেনানায়ক তার প্রস্তাব মেনে নেন এবং স্টুয়ার্টের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এ সময় কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক স্টুয়ার্ট অকস্মাৎ গুলি চালায় তিতুমীরের উপর। তিতুমীরের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তিতুমীর শাহাদত বরণ করেন। কামানের গোলাতে বাঁশের কেল্লা উড়িয়ে দেয়া হয়। সেনাপতি গোলাম মাসুমকে ধরে নিয়ে মিথ্যা বিচারের প্রহসন করে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। এ ছাড়া শত শত কর্মী সিপাহীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

দেশের স্বাধীনতার জন্য তিতুমীর জীবন দান করে যে পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন পাক ভারত উপমহাদেশের মানুষ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আজ স্বাধীনতা লাভ করেছে। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জনক হিসাবে আমরা তিতুমীরকে চিহ্নিত করতে পারি। স্বাধীনতার স্পৃহা কতোটা গভীর হলে একটি সুসংগঠিত বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লার মতো ভঙ্গুর প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরী করে একজন মানুষ লড়াই করার মতো সাহস দেখাতে পারে, তিতুমীর তা দেখিয়েছিলেন। আর তাই তো উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বীর তিতুমীরের নাম চির উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ইংরেজদের সাথে টিপু সুলতানের যুদ্ধ

মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে ইংরেজরা পরাজিত হবার পর তলেগাঁও এর যুদ্ধে মারাঠারা ইংরেজ বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। মারাঠা রাজ্যের যে সমস্ত অঞ্চল ইংরেজ দখলে সেগুলোকে ফিরিয়ে দিতে হলো। প্রকৃত প্রস্তাবে বৃটিশ মর্জাদা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। হেস্টিংস বলেন, "সন্ধির কথা পড়ে আমার লজ্জায় মাটির মধ্যে ডুবে যেতে ইচ্ছা করে।" হেরে যাওয়ার গ্লানি মুছতে ইংরেজরা মহীশুরের টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। চতুর্থ মহীশুর যুদ্ধে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ওয়েলেসলি পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক বিবৃতিতে নিজের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন, "প্রথম কাজ হলো টিপু সুলতানের অধিকারে মালাবার উপকূলে যে এলাকা রয়েছে তা দখল করা, দ্বিতীয় কাজ হলো করমণ্ডল উপকূল থেকে সোজাসুজি টিপুর রাজধানী আক্রমণ করা।

তৃতীয় কাজ হলো যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় টিপুর কাছ থেকে জোড় করে আদায় করা। চতুর্থ কাজ হলো আমাদের মিত্রদের (পেশোয়া এবং নিজাম) পক্ষ থেকে দূত টিপুকে তার রাজসভায় রাখতে বাধ্য করা হবে। পঞ্চম কাজ হলো টিপুর অধীনে যেসব ফরাসিরা কাজ করতো তাদের সকলকে দূর করা। ওয়েলেসলি সুকৌশলে নিজামকে আবার দলে টেনে নিলেন। ওয়েলেসলি আপাতত টিপু সুলতানকে পর্যুদস্ত করার মতলবে ঘোষণা করলেন যে টিপুকে হারিয়ে তার রাজ্যের একটা অংশ মারাঠাদের দেওয়া হবে। লড়াই মাত্র দুই মাস চলেছিল। ইংরেজ সেনাপতি হ্যারিস শৃঙ্খলা, অস্ত্রশস্ত্র এবং পরিচালনার

দিক থেকে প্রকৃত শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে মহীশূর রাজ্যের রাজধানী শ্রীরঙ্গ পত্তমের দিকে অগ্রসর হলেন; বোম্বাইয়ের দিক থেকে এগিয়ে আসছিল সেনাপতি স্টুয়ার্টের সৈন্য দল। ৫ এপ্রিল আরম্ভ হলো শ্রীরঙ্গ পত্তমের অবরোধ। আক্রমণ পরিচালনা করলেন মেজর জেনারেল বেয়র্ড, একদা তিনি টিপু বন্দি ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হতে বেশি সময় লাগেনি। "সিংহের মতো দুঃসাহসী" সুলতান স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করলেন, মহীশূর পক্ষে আট হাজার যোদ্ধা প্রাণ দিয়েছিলেন। বিজয়ী ইংরেজ উল্লাসিত হয়ে সুলতানের প্রাসাদ লুণ্ঠন করল। প্রভূত মনিমানিক্য, চমৎকার সিংহাসন, অপূর্ব হাওদা, হীরকখচিত বন্দুক ও তলোয়ার। স্বর্ণ রৌপ পাত্র, মহামূল্য কার্পেট ও চীনামাটি বাসন ইত্যাদি তাদের হাতে পড়ল। হীরা জহরতের দাম ছিল নয় লক্ষ টাকা, আর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ষাট লক্ষ টাকা ইংরেজদের হস্তগত হলো। তারা সুলতানের বহু মূল্যবান গ্রন্থাগারও লুণ্ঠন করে। পবিত্র কুরানের এক মহার্ঘ খণ্ড বাদে বাকি সব বই ও পুঁথি তারা নিয়ে যায় বিলাতে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। রাজধানী শ্রীরঙ্গ পত্তম কোইম্বাটুর, কানাড়া, মালাবার প্রভৃতি ইংরেজ দখলে গেল।

মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ থেকে একজন নাবালককে রাজা করা হলো, কিন্তু ইংরেজরা তাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে রাখল যে তার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা রইল না। টিপু সুলতানের দুই পুত্র ও পরিজনবর্গকে প্রথমে ভেলোরে এবং রে কলিকাতায় মোটা মাসোহারা দিয়ে বন্দী অবস্থায় রাখা হলো। এখনও টালিগঞ্জে এবং কালিঘাটের কাছে টিপু সুলতানের পরিবার পরিজনদের সমাধি রয়েছে। টিপুর শবদেহ নিয়ে গিয়ে পরে মহীশূরে লালবাগে পিতা হায়দর আলীর কবরের পাশে কবর দেওয়া হয়েছিল।

স্যার জন মারিয়ট সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক হয়েও তিনি টিপু সুলতান সম্পর্কে বলেছেন যে, "টিপু যখন মারা গেলেন, তখন বলা যায় যে ভারতবর্ষের মঞ্চ থেকে এমন একজন অপসৃত হলেন যিনি তখন ছিলেন কোম্পানির দেশীয় শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর, সবচেয়ে অটল, সবচেয়ে একাগ্র এবং সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী। বীরের মত যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়াতে আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি স্যালুট করি হাজার বার।"

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাবলী যে আবেগ উদ্রিক্ত করে এসেছে, তা নিঃসন্দিগ্ধ, নানা দিক থেকে সেই ঘটনাবলী ও তার ফলের ঐতিহাসিক গুরুত্বও নিঃসন্দিগ্ধ। সমগ্র এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রসারের পক্ষে ভারতবর্ষের উপর কর্তৃত্ব ছিল ইংরেজদের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন। ইংরেজ রাজত্ব যখন বাস্তবিকই যেন টলে ওঠে তখন সর্ব শক্তি নিয়ে সেই বিক্ষোভকে দমন করা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের গত্যন্তর ছিল না।

ব্রিটিশ স্বৈরাচার সম্পর্কে অসন্তোষ :

লর্ড ডালহৌসির কুখ্যাত "স্বত্ববিলোপ নীতি" প্রয়োগের ফল খারাপ ছিল। দত্তকপুত্র গ্রহণের ভারতীয় প্রথাকে অগ্রাহ্য করে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসী, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য অধিকার তাঞ্জোর কর্ণাটক রাজ পরিবার এবং পেশোয়া পুত্র নানা সাহেবের প্রতিশ্রুতি ভাতা বন্ধ করে দেওয়া। ফৈজাবাদের বিখ্যাত মৌলভী আহ্মদউল্লা শাহ্ এর মতো গুণি ব্যক্তি ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে গৌরবময় ভূমিকায় নেমেছিল।

সিপাহীদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ :

যে সিপাহীদের সাহস নৈপুণ্য ও একান্ত আনুগত্য ছাড়া ইংরেজদের অগ্রগতি সম্ভব হত না, যারা একদিন আর্কট অবরোধের সময় নিজেরা উপবাস করে ইংরেজ সৈনিকদের মুখে খাদ্য তুলে দিয়েছে, যারা দেশ ও ধর্মের কথা ভুলে

থেকে শুধু ইংরেজদের অন্নদাতার কর্মে অটল ছিল তারাই ক্রমে ক্রমে ইংরেজ প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় ভারতীয় সিপাহীদের বেতনের স্বল্পতা অসন্তোষের যে একটি প্রধান কারণ তাতে সন্দেহ নাই। পদোন্নতির ক্ষেত্র ভারতীয় সৈনিকদের পক্ষে ছিল নিতান্ত সংকীর্ণ। উর্ধ্বতন কর্মচারী প্রায় সকলেই ছিল শ্বেতাঙ্গ। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের আগে থেকেই সিপাহীদের কাছে ইউরোপীয় চরিত্রে শ্রদ্ধেয় বলে বিশেষ কিছু যে মনে হত না তা নিঃসন্দেহ। তারা ভারতীয় সিপাহীদেরকে "শুয়ার" বলে গালি দিত।

১৮৫৭'র পূর্বেই বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত :

এমন কি ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দেও একবার বিদ্রোহ হয়েছিল। ত্রিশ জন ভারতীয় সিপাহীকে জীবন্ত অবস্থায় কামানে পুরে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে শাস্তি বিধান হয়েছিল– এই ছিল সিপাহীদের বিদ্রোহ দমনের অভ্যস্ত ইউরোপীয় রীতি। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই ভেলোরে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, ১৪ জন অফিসার সমেত ১১৩ জন শ্বেতাঙ্গ সিপাহীদের হাতে মারা যায়। তখনই আর্কট থেকে সৈন্যদল এসে "দ্রুত প্রতিশোধ" গ্রহণ করে। অমানুষিক দণ্ড দিয়ে সিপাহীদের দমন করা হয়।

অভ্যুত্থানের সূচনা ও প্রসার :

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যখন এল পলাশীর শতবার্ষিকী, যখন অনেকের মনে অজানা সম্ভাবনার অস্পষ্ট ইঙ্গিত এনে দিল, তখনই যেন বারুদের গাদায় জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি পড়ার মতো কয়েকটা ঘটনার মধ্য দিয়ে অভ্যুত্থানের সূচনা দেখা গেল। জানুয়ারি মাসেই চারদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে এনফিল ও রাইফেল নামে যে বন্দুক সম্প্রতি চালু হয়েছে তার কার্তুজ সিপাহীদের দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে পুরতে হবে। আর হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম নাশ করার উদ্দেশ্যে তাতে গরু এবং শূকরের চর্বি মিশিয়ে দেওয়া আছে। ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরের ছাউনিতে মঙ্গল পান্ডের উদ্দীপনা সিপাহীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে পড়ল; পান্ডের গুলিতে ইংরেজ "এ্যাড্জুটান্টের প্রাণ গেলে একজন বাদে সিপাহীদের মধ্যে আর কেউ তাকে বাধা দেয়নি। সুপরিকল্পনার অভাব ছিল বলেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহ দমন করতে পারল। মঙ্গলপান্ডে আর ঈশ্বরী পাণ্ডের প্রাণদন্ড হলো। এখানে স্মরণ করা কতর্ব্য যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নির্দেশে আজাদ হিন্দ ফৌজও ১৯৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে 'এই চলো দিল্লী' আওয়াজ সারা দেশে ছড়িয়ে পরে মুঘল বংশধর বাহাদুর শাহকে সিপাহীরা হিন্দুস্তানের বাদশা বলে ঘোষণা করল। পাঞ্জাবের স্থানে স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। লক্ষ্ণৌ, বরেলী, শাহ্জাহানপুর, মোরাদাবাদ, এলাহাবাদ, ফতেপুর, কানপুর, এটাওয়া, হথ্রস্ রুড়কি, মথুরা,

ফতেগড়, ফৈজাবাদ প্রভৃতি বহু স্থানে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পরে। কানপুরে নানা সাহেব ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারে জগদীশপুরের জমিদার কোঙর কুমারসিংহ। রোহিলা খন্ড ও বুন্দেলখন্ডের ভূম্যধকারীরা সবাই বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাঁওতালরা বিদ্রোহ করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, নদীয়া, যশোহর বীরভুম, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহ দমনে বিশিষ্ট ইংরেজ সেনাপতি উট্রম ছিল। "জাতি যে বিপ্লবের জন্য জাগ্রত ও সম্পূর্ণ প্রস্তুত" তা বোঝা গিয়েছিল।

বিদ্রোহ দমন ও উভয় পক্ষের নৃশংসতা :

বিদ্রোহের প্রথম দিকে ব্রিটিশ পক্ষ যুদ্ধ স্থলে পরাজিত হলেও জন ও হেনরী লরেন্স হ্যাভ্লক, উট্রম, কলিন ক্যাপবেল প্রভৃতি ইংরেজ নায়কদের সমর কৌশল ও উপস্থিত বুদ্ধি এবং শিখ গোর্খাদের সক্রিয় সাহায্যে বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর ইংরেজ দিল্লী দখল করে বাদশা বাহাদুর শাহকে সপরিবারে বন্দী করে বাদশাহের দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে বিনাবিচারে হত্যা করে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বিদ্রোহীরা এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক হর্ডসসের প্রাণ নেয়।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ৮৭ বৎসর বয়সে এই শেষ মুঘল বাদশাহের মৃত্যু ঘটে। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাই বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। তাতিয়া তোপী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ঢাকায় আরমানিটোলাতে শত শত ভারতীয় সিপাহীদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। নানা সাহেব পরাজিত হয়ে নেপালে পলায়ন করেন এবং মৃত্যু বরণ করেন। ভারতীয় সিপাহীরা কানপুরে গঙ্গাবক্ষে বহু ইংরেজ নির্দোষ নরনারীকে হত্যা করে। সেনাধ্যক্ষ নীলকর চাবুক মেরে রক্তচিহ্ন জিভ দিয়ে চাটতে বাধ্য করে বিদ্রোহীদের দলবেধে ফাঁসি দিয়েছে।

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ :

বিদ্রোহের প্রারম্ভ সম্বন্ধে কোনো স্থিরতা ছিল না। সংবাদ সর্বত্র প্রেরণ ব্যাপারে কোনো সংগঠন ছিল না। একযোগে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিলে ব্রিটিশের যে সমূহ বিপদ উপস্থিত হতো তা হয়নি। রাজা জমিদাররা প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশদের পক্ষে ছিল। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীদের অবদান ছিল অনেক। ইংল্যান্ড থেকে পারস্য থেকে সিঙ্গাপুর থেকে ক্রমাগত সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আস্থা ছিল নৌবাহিনীর কাজ। ফৈজাবাদের আহ্মদ উল্লার মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব খুবই কার্যকরী হয়েছিল। সংহতি ও সংগঠনের অভাব থাকলে যে আবেগ ও অসম সাহস দিয়ে সেই ক্ষতিপূরণ করা যায় না তাই প্রমাণিত হলো অভ্যুত্থানের পরাজয়ে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থানের প্রকৃতি :

"ভারতীয় মহাবিদ্রোহই সংজ্ঞা দিয়েছেন প্রখ্যাতনামা বিনায়ক দামোদর সাভার কর "ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ" নামে এর ইতিহাস লিখেছেন। বিদ্রোহের সময় বাংলাদেশে তার ছাপ বেশি পড়েনি বলা হয় কিন্তু সেখানেও অসন্তোষের অভাব ছিল না। ব্রিটিশদের পরাজয়ের সংবাদে সবাই পুলকিত হয়ে উঠত। বারানসী, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক বিক্ষোভ ও ইংরেজ শাসনের পক্ষে কঠোর সংকটের সৃষ্টি করেছিল। বিদ্রোহের ফলে হিন্দু-মুসলিম সৌভ্রাতৃত্ব অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য ছিল। হিন্দু এবং মুসলমানের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাঙালি কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় বলেছেন 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে বাঁচিতে চায় দাসত্ব শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?'

বিদ্রোহের ফল :

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপুল অভ্যুত্থান পরাজিত হলো, পশ্চাদপদ ভারতবর্ষ অগ্রসর ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হলো। ভারতবর্ষ দীর্ঘ দিন পরাধীনতার যন্ত্রণা বহন করে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধিরূপে লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় বড়লাট হলেন। মহারাণীর ঘোষণা পত্রে বলা হয় যে দেশীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে সন্ধির সমস্ত শর্ত মেনে চলা হবে। হিন্দু মুসলমান কারও ধর্ম বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা হবে না। গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতবাসীকে ঢুকতে দেয়া হবে না। সিপাহীকে সর্বদাই ইংরেজ কর্মচারীর অধীনে থাকতে হবে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থানে যে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল, তাতে অন্তত আকাশ অনেকটা পরিস্কার হয়ে গেল, ভারত স্বাধীনতার ইতিহাসের এক নতুন পর্যায় আরম্ভ হলো।

ইংরেজদের সাথে প্রথম শিখ যুদ্ধ :

ব্রিটিশদের এ ভারতবর্ষ থেকে তারাতে ইতিহাসে বহুযুদ্ধ বিগ্রহ করতে হয়েছে। অনেক জীবন বলিদান দিতে হয়েছে। যান মালের অনেক ক্ষতি দিতে হয়েছে। ইতোমধ্যে হার্ডিঞ্জ গভর্নর জেনারেল হয়ে এসেছিলেন। যুদ্ধের জন্য ইংরেজও প্রস্তুত হচ্ছিল। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অমৃতসরের সন্ধির শর্ত উপেক্ষা করে শিখ সৈন্যরা শতদ্রু নদী অতিক্রম করায় প্রথম শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। সারহিউ গফ্ ছিলেন ব্রিটিশ সেনাপতি, গভর্নর জেনারেল স্বয়ং সঙ্গে ছিলেন। ফিরোজপুর আম্বালা এবং লুধিয়ানার দিক থেকে পূর্বেই ইংরেজদের আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল। লড়াই হয় মুদকি, ফিরোজ শহর, সুধিয়ানা, আলিওয়াল এবং সোব্রাঁওতে। একমাত্র লুধিয়ানাতে শিখরা ছোটখাটো বিজয় লাভ করে কিন্তু অন্যত্র তাদের বিপর্যয় ঘটে। সাহসের অভাব শিখপক্ষে ছিল না। যুদ্ধ হয়েছিল এমনভাবে যে জয়পরাজয় বহুক্ষণ যুদ্ধ অনিশ্চিত ছিল। উভয় পক্ষের ক্ষতিও হয়

প্রচুর। কিন্তু ইংরেজরা যে জয়ী তাতে সন্দেহ রইল না। লাহোরে হাজির হয়ে নিজেদের খুশিমত সন্ধির শর্ত ইংরেজ নির্ধারণ করে দিল। শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ইংরেজদের অধিকারে গেল। শিখ বাহিনীর শক্তি হ্রাস করে দেওয়া হলো। ক্ষতিপূরণ বাবদে ইংরেজ দেড় কোটি টাকা দাবি করায় দেখা গেল যে শিখ রাজ্যের পক্ষে তা দেওয়া অসম্ভব এবং তখন স্থির হলো যে শিখরা দেবে পঞ্চাশ লক্ষ আর জম্মুর শাসক গুলাব সিংহ পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দিয়ে কাশ্মীরের রাজা বলে স্বীকৃত হবে। লাহোরে ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন হলো। দলীপ সিংহকে এই সমস্ত শর্তে মহারাজা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ডোগরা রাজপুত গুলাব সিংহ মাসিক তিন টাকা বেতনে সিপাহী হয়ে এসে পরে ক্রমে রঞ্জিৎ সিংহের অধীনে জম্মুর শাসক হয়েছিলে। এখন ইংরেজের অনুগ্রহে তিনি হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা। যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাব যে একেবারে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে এসে গেল তাতে সন্দেহ নেই।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে লর্ড হার্ডিঞ্জ এই কৃতিত্ব সম্বন্ধে এতই উৎফুল্ল হয়েছিলেন যে তিনি বলেন, "আগামী সাত বৎসরে ভারতবর্ষে একবারও কামান দাগতে হবে না"। এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য যে ব্যর্থ হয়েছিল তা আমরা দেখব। আর এখানে শুধু স্মরণ করে যাব যে হার্ডিঞ্জ এবং বেন্টিং লর্ড রিপন এর আমলে দেশীয় রাজ্যে শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য বিস্তার, সতীদাহ প্রথা নিষেধ, শিশু হত্যা নিবারণ, রেলপথ ও পূর্তকার্য সম্পর্কে কিছু কাজও হয়েছিল। ইতিহাসে কোনো আন্দোলন ও সংগ্রামই ব্যর্থ হয় না।

দৃপ্ত যৌবনে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবে জীবন দান

ইতিহাসে আপন দুইভাই ক্ষুদিরাম ও অধিরাম ব্রিটিশ বড় লাটকে মারতে যেয়ে ধরা পরে অধিরামের দ্বিপান্তর হয়, ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

মাস্টারদা সূর্য্যসেন চট্রগ্রাম পাহাড় তলিতে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করে ধৃত হয়ে ফাঁসিতে জীবন দান করেন। বীর কন্যা প্রিতিলতা ইংরেজদের ক্লাব আক্রমণ করে ফেরার সময় পিছন দিক থেকে ইংরেজরা গুলি করলে তিনি পটাশিয়াম ছায়ুন্যাট বিষ খেয়ে আত্মদান করেন। বিনয়, বাদল, দিনেশ, কলেজ ছাত্র ছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে যেয়ে গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যান। দৃপ্ত যৌবনে জীবন দানের ইতিহাসে তারা চিরদিন অমর হয়ে রইবেন। দিনাজপুরের তথা বাংলার কৃষক বিদ্রোহের নেতা বাঘাযতিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করেন। ইতিহাসে বাঘা যতিনের নাম চির অম্লান হয়ে রইবে। বাংলার বলিষ্ঠ কৃষক বিদ্রোহের নেতা ছিলেন বীর সমশের গাজী। হাজী শরিয়ত উল্লাহ দুদু মিয়া এরা সবাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যুদ্ধ করেন প্রাণ বিসর্জন দেন। ইতিহাস তাদের অবদান ভুলবে না কোনো দিন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

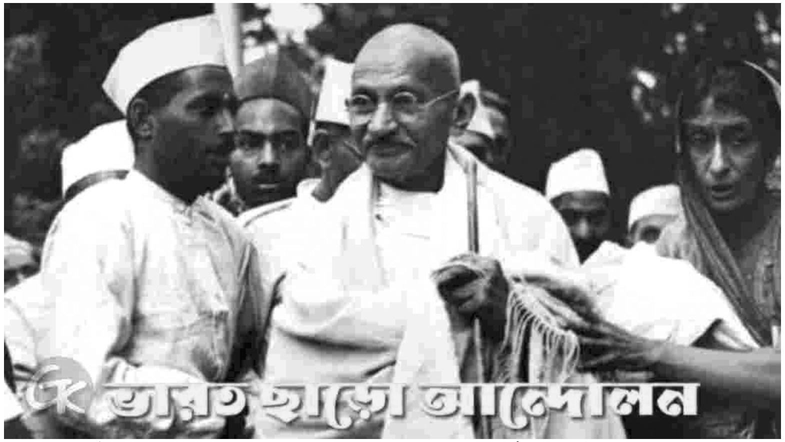

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হয় যে অবিলম্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। "হরিজন" পত্রিকায় গান্ধীজী লিখলেন: "আলাপ-আলোচনার আর কোনও সার্থকতা নেই; হয় তো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করে নেবে নয় নেবে না। আর একটা সুযো গ দেওয়ার কথা উঠছেই না। বস্তুত, এটা হলো প্রকাশ্য বিদ্রোহ"। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা বসল বোম্বাইয়ে ৯ আগস্ট তারিখে। সেখানে গান্ধীজী বললেন, "আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করব। স্বাধীনতা টুপ করে আকাশ থেকে পড়বে না। আর এই হবে আমার জীবনের শেষ লড়াই।" দেশবাসীকে তিনি নতুন একটা মন্ত্র দিলেন: "করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে" (Do or die!) ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বলে এই আন্দোলনে সর্বত্র ঐ ধ্বনি উঠল।

৯ আগস্ট সকালে গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের প্রধান নেতারা প্রায় সকলেই গ্রেফতার হলেন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হলো। সারা দেশ জুড়ে বিদ্রোহের আগুন তখন জ্বলে উঠেছিল। নেতারা অনুপস্থিত বিচক্ষণ নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনো নির্দেশ আসছে না। শুধু কয়েকজন সংগঠক আত্মগোপন করে আন্দোলন পরিচালনার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ তখন ফেটে পড়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির কথা ভুলে সাধারণ জনগণ সরকারের পুলিশ ফাঁড়ি রেলস্টেশন ডাকঘরে আগুন দিল, রেললাইন উপড়ে ফেলে যাতায়াত ব্যবস্থাকে বিকল করে বন্ধ করে দিল, কিছুকাল সারা ভারতে একটা প্রকাণ্ড ঝড় যেন বয়ে গেল। মোট ৫৩৮ বার পুলিশ আর সৈন্যবাহিনীকে গুলি চালাতে হয়েছিল।

অভ্যুত্থানে যোগদানকারীদের মধ্যে নয় শতের বেশি লোকের প্রাণ গেল, ত্রিশ জন পুলিশ ও এগারো জন সিপাহীকেও মরতে হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ দমননীতির ক্ষুব্ধ জঘন্য পরিচয় আবার দেশবাসী পুরো মাত্রায় পেল। ভারত ছাড়ো আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল রক্তদান জীবন দান ব্যর্থ হয়নি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তরে মাউন্ট ব্যাটন পরিকল্পনা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বৃটিশ রাজ বংশোদ্ভূত লর্ড মাউন্ট ব্যাটন বড়লাট হয়ে এলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর কালে জওহর লাল নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেসের প্রধান নেতাদের কাছে যে বৃটেনের সদিচ্ছা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন, মহাত্মা গান্ধীকেও আন্তরিকতার ভাব দেখিয়ে মুগ্ধ করতে পেরেছেন তা অস্বীকার করা যায় না। জুন মাসে তিনি বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন যে, মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলোর বাসিন্দারা চাইলে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে। শুধু বাংলা আর পাঞ্জাবকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভেঙে ভাগ করা দরকার হবে। বাংলা আর পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করে কোন অংশ পাকিস্তানে এবং কোন অংশ ভারতে যাবে, তা স্থির করার জন্য এক সীমানা কমিশন নিযুক্ত হবে। জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের স্বাধীনতা বিধি পাস করল, স্থির হলো ১৫ আগস্ট ভারতের শাসনভার দিল্লীতে ভারতবাসীর হাতে দেওয়া হবে, করাচিতে পাকিস্তানের কর্তৃত্ব পাকিস্তানিদের দেওয়া হবে। ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অংশ হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হলো, মাউন্ট ব্যাটনকেই বড়লাট পদে রেখে দেওয়া হলো। পাকিস্তানে অনুরূপ অনুষ্ঠানে জিন্না হলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল। ক্ষমতা হস্তান্তরের পালা এইভাবে শেষ হলো।

লক্ষ লক্ষ জীবনের প্রতিদানে স্বাধীন ভারতবর্ষ

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট তারিখটি আমাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সুদীর্ঘ পরাধীনতার অভিশাপ চিহ্নকে অবলুপ্ত করার উদ্যোগ তখনও অনারব্ধ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। জগতের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের যেখানে বাস, যার ইতিহাস জ্ঞানে, কর্মে গরিমায় মহীয়ান, বহুদিনের দুর্ভোগ কাটিয়ে আবার সেই দেশ নিজেদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলো।

জওহরলাল নেহেরু ১৪ আগস্টের মধ্যরাতে বক্তৃতা করতে উঠে পরলেন: "জীবন ও মুক্তির নতুন আস্বাদ আজ দেশকে জাগিয়েছে, নিয়তির সঙ্গে যেন আজ আমরা অভিসারে মিলিত হয়েছি"। মধ্য রাত্রির পর দেশ ও দেশবাসীর সেবা এবং বিশ্বশান্তি ও মানবতার কল্যাণের প্রতিজ্ঞা নিয়ে সংবিধান প্রণয়নের প্রারম্ভ ঘোষিত হলো। সাম্প্রতিক বহু দুর্ঘটনার গ্লানি ভুলে এদেশের মানুষ ক্ষণিকের জন্যও নবজীবনের উন্মাদনা অনুভব করল।

গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান

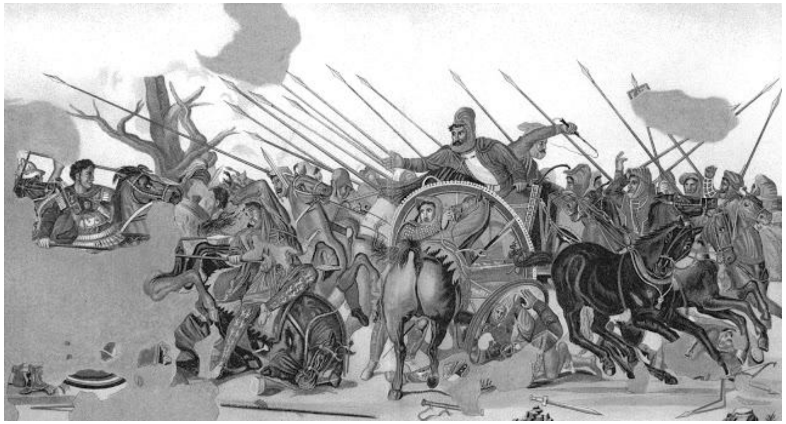

ভারত অভিযানের সূচনা :

এরিয়ান, কার্টিংয়াস, ডায়োডোরাস, প্লুটার্ক প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের চেতনায় আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্য সম্রাটকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে আলেকজান্ডার পারস্য সম্রাজ্যের পূর্ব ও উত্তর পূর্ব দিকের প্রদেশ জয় কর তে অগ্রসর হলেন। তিন বৎসরের মধ্যে তিনি হিন্দুকুশ পর্বতের পরিশ্চমস্থ পূর্ব ইরানায় অঞ্চল জয় করেন। ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম দিকে ব্যাকট্রিয়া বোখারা ও শিরদরিয়া অঞ্চল ও নিকাইয়া জয় করে তিনি ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

তক্ষশিলার রাজ অম্ভির দেশদ্রোহিতা :

তিনি নিকাইয়া নামক স্থান হতে তক্ষশিলার রাজার নিকট দূত প্রেরণ করে ভারত অভিযানের অভিপ্রায় জানান এবং বিনা ভারতীয় রাজগণের আনুগত্য লাভ করা সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু এ দূত তক্ষশিলায় পৌঁছবার পূর্বেই অম্ভি আলেকজান্ডারের নিকট সংবাদ পাঠিয়েছিলেন তক্ষশিলা রাজ্য আক্রমণ করা হবে না, এ শর্তে তিনি আলেকজান্ডারকে সাহায্যদানে প্রস্তুত আছেন। অম্ভি আলেকজান্ডারকে ৬৫টি হাতী বহু সংখ্যক ভেড়া ও ৩,০০০ ষাড় উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন।

কোফিউস, সঞ্জয়, অশ্বজিৎ, শশীগুপ্ত প্রমুখের আনুগত্য :

আলেকজান্ডার কোফিউস, সঞ্জয়, অশ্বজিৎ, শশীগুপ্ত প্রমুখ রাজাগণের নিকট হতেও সহায়তা লাভ করেছিলেন। এভাবে আলেকজান্ডারের অগ্রগতির পথে কোনো বাধা না থাকায় তিনি তাঁর ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ অনায়াসে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ

করেন। কিন্তু আলেকজান্ডার বাধা পেলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণ ও প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলোর জনসাধারণ হতে। পুষ্করাবতীর রাজা অষ্টক তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে বিদেশি আক্রমণকারীর পথ রোধ করেন। দীর্ঘ ত্রিশ দিন গ্রিক বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ করে অবশেষে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দান করেন।

অশ্বায়ন, অশ্বকায়ন, মশকাবতী, অন্ডক প্রমুখের প্রতিরোধ :

অশ্বায়ন ও অশ্বকায়ন জাতি আলেকজান্ডারের অগ্রগতি রোধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের পর একমাত্র অশ্বকায়ন প্রজাতন্ত্রের মোট ৭ হাজার সৈন্যকে আলেকজান্ডারের আদেশে হত্যা করা হয়েছিল।

নিসা, সিন্ধু ও পুষ্করাবতীর মধ্যবর্তী শহর ও বরণ দুর্গ জয় :

অতঃপর “নিসা” নামক নগর রাষ্ট্র, সিন্ধু ও পুস্করাবতীর মধ্যবর্তী যাবতীয় শহর এবং বরণ নামক পার্বত্য দুর্গ জয় করে ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার সর্বপ্রথম প্রকৃত ভারতীয় রাজ্যে প্রবেশ করেন।

পুরুরাজ মিত্রহীন :

ঝিলাম ও চীনার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের পুরু ছিল ভিন্ন ধাতুতে গড়া। কিন্তু হীনচেতা, দেশদ্রোহী রাজাগণের সাহায্য-সহায়তার অপেক্ষা না রেখে দেশপ্রেমিক বীর রাজা পুরু নিজ রাজ্য রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তিনি বললেন, “বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্র মেদিনী”। আলেকজান্ডার পুরুর নিকট দূত প্রেরণ করে তাঁকে তক্ষশিলার দরবারে উপস্থিত হতে জানালে রাজা পুরু সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে অসিহস্তে নিজ রাজ্যের সীমায় আলেকজান্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করবেন বলে জানান। বিনা যুদ্ধে পুরু রাজ্য দখল করা সম্ভব হবে না দেখে আলেকজান্ডার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

ঝিলাম নদীর দুই তীরে দুই পক্ষের সৈন্য সমাবেশ :

পুরুকে মিত্র সংগ্রহের সময় ও সুযোগ না দেয়ার উদ্দেশ্যে আলেকজান্ডার ঝিলাম নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন। নদীর অপর তীরে পুরু তাঁর সৈন্য সমাবেশ করেন। পুরুর নির্ভীক সৈন্যগণের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে সাহস না পেয়ে আলেকজান্ডার রাত্রির অন্ধকারে ঝিলাম নদী অতিক্রম করলেন। প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আলেকজান্ডার কূট কৌশলের আশ্রয় নিলেন। তিনি নিজ শিবিরে আলো জ্বেলে রেখে গোপনে রাত্রির অন্ধকারে সসৈন্যে ঝিলাম নদীর গতিপথ ধরে সতের মাইল অগ্রসর হলেন এবং প্রত্যুষে একস্থানে গোপনে ঝিলাম নদী অতিক্রম করে পুরুকে আক্রমণ করলেন। পুরু এরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আলেকজান্ডারকে বাধাদানের জন্য তিনি নিজ পুত্রকে দুই হাজার সৈন্য ও ১২০টি রথসহ প্রেরণ করেন। পুরুর পুত্র আলেকজান্ডারের সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ হারান। ইতোমধ্যে পুরু পঞ্চাশ হাজার পদাতিক চার হাজার অশ্বারোহী, তিনশত রথ এবং দুইশত হাতীসহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সামরিক শক্তির দিক হতে পুরুর জয়

অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পূর্ব রাত্রির বৃষ্টিপাতে ঝিলাম নদীতীরের যুদ্ধক্ষেত্র পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত হয়ে পরেছিল। এমতাবস্থায় পুরুর অশ্বারোহী তীরন্দাজগণ তাদের সুদীর্ঘ ধনুকের অগ্রভাগ মাটিতে রেখে তীর সংযোজন করতে পারে নাই। রথের চাকাগুলোও কাদায় আটকে গিয়ে অচল হয়ে পড়ল। এ সুযোগে আলেকজান্ডারের অশ্বারোহী সৈন্যগণ দ্রুতবেগে পুরুর সৈন্যের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। এ প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে পুরুর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। প্লুটার্কের বিবরণ হতে জানা যায় যে পুরুর সৈন্যগণ এরূপ অবস্থায় সুদীর্ঘ আট ঘণ্টা যুদ্ধ চালিয়েছিল। পুরু পারস্য সম্রাট জ্যারিয়াস-এর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেননি, তিনি নিজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পরেছে দেখেও নিজে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে চললেন। তাঁর শরীরের নয়টি স্থান হতে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে রক্ত ধারা বইছে, এ অবস্থায় তাঁকে বন্দী করা সম্ভব হয়েছিল। বন্দী অবস্থায় পুরুকে আলেকজান্ডারের সম্মুখে উপস্থিত করা হলে আলেকজান্ডার পুরুকে বলেন কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন। জিজ্ঞেস করলে পুরু রাজোচিত সম্মান দাবি করেন। আলেকজান্ডার এতে সন্তুষ্ট হয়ে পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং তদুপরি পূর্বদিকে অবস্থিত আরও পনেরটি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য পুরুকে দান করেন।

কঠ ও পার্শ্ববর্তী প্রজাতন্ত্রগুলোর আনুগত্য লাভ :

অতঃপর আলেকজান্ডার রাভী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পার্শ্ববর্তী প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলো আক্রমণ করেন। তারা বিশেষ করে দুর্বল কঠ রাজ্যের রাজা আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন।

প্রত্যাবর্তন :

পর পর যুদ্ধ জয় করে আলেকজান্ডারের যুদ্ধ জয়ের স্পৃহা বেড়ে গেল। তিনি সসৈন্যে বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তার সৈন্যগণ আর অধিক দূর অগ্রসর হতে স্বীকৃত হলো না। তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বাধ্য হয়েই আলেকজান্ডার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত স্থির করলেন। মালব, অর্জুনায়ন চীনাব তার প্রত্যাবর্তন পথে বাধা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

আলেকজান্ডারের ভারত ত্যাগ :

সিন্ধু নদ অঞ্চলের শুদ্র, মুষিক, পার্থ উপজাতি কর্তৃক বাধা পান যুদ্ধে তারা হেরে যায়। আলেকজান্ডার গেড্রোসিয়ার (বেলুচিস্তানের) মধ্য দিয়ে ব্যাবিলনের পথে রওয়ানা হলেন। এই ব্যাবিলনেই তার মৃত্যু হয়।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফল :

ফলের বিচার করলে দেখা যায় রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। দখলীয় ৭টি প্রদেশের মধ্যে ৫টি ছিল ভারতীয় আর বাহিরে ছিল দুটি রাজ্য। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর

সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছা মাত্রই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এদেশে গ্রিক আধিপত্যের সব চিহ্ন মুছে ফেলে দিয়েছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ও রাজগণের বিশ্বাসঘাতকতা :

স্থানীয় রাজাগণের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই আলেকজান্ডারের বিজয় সম্ভব হয়েছিল। একমাত্র পুরু এবং উপদলগুলো তার বিরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করেছিল।

সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ধর্ম বা সামরিক ক্ষেত্রে প্রভাবহীনতা :

সামরিক পদ্ধতি ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর আলেকজান্ডারের অভিযানের কোনো প্রভাবই ছিল না।

আলেকজান্ডারের নির্মম অত্যাচার :

অর্জুনায়নদের শিশুগণসহ স্ত্রী লোকদের উপর সেনাবাহিনীর অত্যাচার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া মালবদেশের শহরগুলোর স্ত্রীলোক ও শিশুদের নির্মম হত্যা পরবর্তীকালের সুলতান মাহমুদ, তৈমুর চেঙ্গিশ খান ও নাদির শাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রত্যক্ষ ফল :

তিনটি প্রত্যক্ষ ফল পরিলক্ষিত হয় (১) বুজিফালা নিকিয়া সিন্ধু ও চীনার নদীর সঙ্গমস্থলে এবং পাঞ্জাবের সোগডিয়ান আলেকজান্দ্রিয়া একটি ঔপনিবেশিক শহর স্থাপন করেছিলেন কিন্তু এগুলোও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। (২) এ অভিযানের ফলে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে তিনটি স্থল পথ ও একটি জলপথ আবিষ্কৃত হয়েছিল। (৩) ভৌগোলিক ও অপরাপর জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে বিস্তার লাভ করেছিল।

পরোক্ষ ফল :

(১) পুরু, অম্ভি অভিসার প্রভৃতি রাজগণকে আলেকজান্ডার তাঁর বিজিত রাজ্য দান করায় উত্তরাপথের রাজনৈতিক ঐক্য বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল।
(২) গ্রিক ও রোমান শিল্পের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।
(৩) আলেকজান্ডারের অভিযান প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষ্টির আদান প্রদানের পথ প্রশস্ত করেছিল।
(৪) আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে ভারতীয় শিল্পকলা বিজ্ঞান মুদ্রানীতি প্রভৃতির উপর গ্রিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

সর্বশেষ ফলাফলে উল্লেখ করা যায় বহু ভারতবাসীর প্রাণনাশ, সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং অশেষ দুঃখ দুর্দশার বিনিময়ে উদ্ভুত হয়েছিল। আলেকজান্ডার পরবর্তীকালে আক্রমণকারী সুলতান মাহমুদ, তৈমুর এবং নাদির শাহের পথ প্রদর্শক ছিলেন।

ভারতবর্ষে তৈমুর লঙ্গ এর আক্রমণ (১৩৯৮-৯৯খ্রি.)

তৈমুরের পরিচয় :

ফিরোজ শাহের বংশধরগণ যখন গৃহবিবাদে জড়িত এবং তাঁদের নাতির ফলে সাম্রাজ্যের ধ্বংস যখন অনিবার্য তখন সমরকন্দের অধিপতি আমীর তৈমুর এক বিরাট তুর্কী সেনাবাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। তৈমুর ছিলেন তুর্কী চাঘতাই বংশীয় তুরঘাই এর পুত্র। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ধর্মীয় দিক হতে সামানী বৌদ্ধ ছিলেন। তৈমুরের পিতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ছিলেন। তৈমুর লঙ্গ অর্থাৎ খোঁড়া ছিলেন। এজন্য তিনি ইতিহাসে তৈমুর লঙ্গ নামে পরিচিত। তেত্রিশ বৎসর বয়সে তৈমুর চাঘতাই তুর্কীদের নেতৃত্বপদ লাভ করেন। এ সময়ে তাঁর মনে পৃথিবী জয়ের বাসনা জাগরিত হয়। পারস্য আফগানিস্তান ও মেসোপটিমিয়া অধিকারের পর তিনি ভারতের দিকে অগ্রসর হন।

কারণ :

প্রথমত: ভারতবর্ষের বিপুল সম্পদ তাঁকে এদেশের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। দ্বিতীয়ত: রাজ্য জয়ের আনন্দ। তৃতীয়ত: দিল্লীর শাসকদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও পৌত্তলিকদের প্রতি উদারতা তাঁর অসহ্য ছিল। অনেকের মতে, পৌত্তলিকতা ধ্বংস করাই ছিল তাঁর আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য।

দিল্লী আক্রমণ, লুণ্ঠন ও রক্তপাত :

১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি তাঁর পৌত্র মুহম্মদকে ভারত অভিযানে প্রেরণ করেন। মুহম্মদ ছয় মাস অবরোধের পর মুলতান অধিকার করেন। ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু নদী অতিক্রম করে তৈমুর ডিসেম্বর মাসে দিল্লীর দ্বারে উপনীত হন। মাহমুদ

শাহ্ ও তাঁর মন্ত্রী মুল্লু ইকবাল বিরাট সৈন্য বাহিনী সংগ্রহ করে তাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন, কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। অতঃপর তৈমুর বিজয়ীর বেশে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। প্রচুর অর্থদন্ডের বিনিময়ে তিনি নাগরিকদিগকে জীবননাশ হতে অব্যাহতি দিতে রাজী হলেন। কিন্তু সৈন্যরা অর্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলে তাদের আচরণে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে হিন্দুরা বাধা প্রদান করে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তৈমুর ব্যাপক হত্যার আদেশ দেন। তাঁর আদেশে দিল্লী এক রক্তাক্ত কসাইখানায় পরিণত হয়। তৈমুরের সৈন্য কর্তৃক দিল্লী লুণ্ঠন সে রক্তাপ্লুত নগরীর দুর্ভাগ্যের ইতিহাসে এক চরম হৃদয়স্পর্শী ঘটনা।

তৈমুরের ভারত ত্যাগ :

ভারতে অবস্থান করার ইচ্ছা তৈমুরের ছিল না। পঁচিশ দিন অবস্থান করার পর অসংখ্য ক্রীতদাস ও অগণিত লুণ্ঠিত সম্পদসহ তিনি দিল্লী ত্যাগ করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি মীরাট বিধ্বস্ত করেন, আগ্রা অধিকার ও জম্মু লুণ্ঠন করেন। তিনি খিজির খানকে মুলতান, লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান। অতঃপর ভয় ও ধ্বংস, দুর্ভিক্ষ ও মড়কের এক ভীতিপ্রদ কাহিনি পশ্চাদে রেখে তিনি ভারত ত্যাগ করেন।

ফলাফল :

তৈমুরের ভারত আক্রমণের ফলে এদেশের জনবল ও ধনবলের যে মারাত্মক ক্ষতি হয় তা পূরণ করতে প্রায় অর্ধশতাব্দী লেগে ছিল। হাজার হাজার নিরীহ লোকের জীবন তিনি বিনষ্ট করেছিলেন। অনেক নগর ও বড় বড় গ্রাম অত্যাচারের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল এবং অনেক জমি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব এবং দেশবাসীর দুর্দশা :

গুদামজাত শস্য ও রোপিত শস্যের ব্যাপক ধ্বংসের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সে সঙ্গে মহামারী দেখা দেয়। যারা তৈমুরের অত্যাচার হতে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল তারা কিছুদিনের মধ্যেই দুর্ভিক্ষে মারা যায়। দুই মাস ধরে দিল্লী শহরে কোনও পাখিকে ডানা মেলে উড়তে দেখা যায় নাই।

দিল্লী সালতানাতের উপর আঘাত :

তৈমুরের আক্রমণ দিল্লীর সালতানাতকেও দুর্বল করে ফেলে এবং এর পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতীয় শিল্পের ক্ষতি ও মধ্য এশিয়ায় এর বিস্তৃতি :

তিনি এদেশের বহু শহর ও অট্টালিকা ধ্বংস করেছিলেন। ফলে শিল্পের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

তুঘলক বংশের উপর আঘাত :

এভাবে তৈমুরের আঘাত আক্রমণ শেষ পর্যন্ত তুঘলক শাসনের অবসান ঘটায়। সম্রাট বাবর মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তৈমুরের অবদান।

মহারাজা অশোক (২৭৩-২৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

সিংহাসন লাভ :

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তার পুত্র অশোকের সিংহাসন লাভ ভারত ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ঐতিহাসিকগণ মৌর্য সম্রাট অশোককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা বলে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন।

ভ্রাতৃ বিরোধ :

পিতা বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোকের সিংহাসন লাভে ভ্রাতাদের মধ্যে এক তীব্র উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে দ্বন্দ্বে অশোক তার ভাই ভ্রাতাদের হত্যা করে সিংহাসন নিষ্কন্টক করেছিলেন।

অশোকের লিপি :

অশোকের রাজত্বকাল সম্পর্কে তারই আদেশে খোদিত লিপি হতে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পর্বত গাত্রে এবং স্তম্ভগাত্রে এ লিপিগুলো খোদিত হয়েছে। দেবানাম পিয় পিয় দশী প্রভৃতি আখ্যা বা উপাধি। হিজ ম্যাজেস্টি উপাধি মর্যাদা হিসেবে ব্যবহার করতেন।

উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলার শাসক যুবরাজ অশোক :

বিন্দুসারের রাজত্বকালে যুবরাজ অশোক উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সম্রাট-সুলভ মনোবৃত্তি :

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র এবং বিন্দুসারের পুত্র অশোক প্রাসাদের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন। যুবরাজ সুলভ আমোদ, মৃগয়া, দ্যূত ক্রীড়া যুদ্ধবিগ্রহাদি তিনি স্বভাবতই ভালোবাসতেন।

সম্রাট অশোকের ঐতিহাসিক কলিঙ্গ যুদ্ধ

সম্ভাব্য কারণ :

ত্রয়োদশ শিলালিপিতে কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলাফলের সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে কলিঙ্গ রাজ্য স্বাধীন রাজ্য ছিল। এ রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা ছিল অত্যধিক ষাট হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্বারোহী, সাতশত হাতী নিয়ে গঠিত কলিঙ্গ রাজ্যের সেনাবাহিনী মৌর্য সম্রাজ্যের পক্ষে উপেক্ষার বস্তু ছিল না। তদুপরি কলিঙ্গ যুদ্ধে হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা হতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে অশোকের আমলে কলিঙ্গ রাজ্যে র সেনাবাহিনী বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং অশোক কলিঙ্গ রাজ্যের গর্ব খর্ব করতে অগ্রসর হলেন। এ যুদ্ধ অশোকের অভিষেকের নয় বৎসর পর সংঘটিত হয়েছিল।

ফলাফল :

যুদ্ধে কলিঙ্গ রাজ্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলো এবং এটি মৌর্য্য সম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হলো। এ যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক অশোকের সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছিল। এক লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল এবং কয়েক লক্ষ লোক যুদ্ধের মালামাল আনুষঙ্গিক লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতির ফলে মারা গিয়েছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের এই ভয়াবহতা মর্মান্তিকতা ও বীভৎসতা দেখে অশোকের মধ্যে যে মহামানব সুপ্ত ছিলেন তিনি যেন জেগে উঠলেন। অশোক সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক ভগবান বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হলেন। যুদ্ধে অশোকের মনে যে আঘাত লেগেছিল তা ত্রয়োদশ শিলালিপিতে পরিস্কারভাবে লিখা রয়েছে। দারুণ অনুশোচনায় তার মনপ্রাণ ভরে উঠেছিল। তা ও শিলালিপি পাঠে আজও অনুভব করা যায়। মৌর্য

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতিতেও এর প্রভা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। অশোক তাঁর সীমান্তবর্তী দেশগুলোকে এই বলে আশ্বাস দিলেন যে তারা যেন মৌর্য সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিকে ভয় না করে। অশোক তাদের দুঃখের কারণ না হয়ে সুখের কারণ হবেন। দিগ্বিজয় পরিত্যাগ করে তিনি ধর্ম বিজয় জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র কেউ যাতে দিগ্বিজয়ের পথে আর অগ্রসর না হয় সেজন্য তিনি ঘোষণা কারলেন। তিনি বললেন মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ। স্বভাবতই তিনি মৌর্য সম্রাটের চির অনুসৃত দিগ্বিজয়-নীতি পরিত্যাগ করলেন।

অশোকের ধর্ম ও ধর্মনীতি :

কলিঙ্গ যুদ্ধে যে রক্ত গঙ্গা বয়ে গিয়েছিল তা অশোকের অন্তরে গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি করেছিল। তিনি শান্তি ও মৈত্রীর প্রতীক গৌতম বুদ্ধর ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

ধর্মনীতি :

অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁর ধর্মনীতি বৌদ্ধ ও অপরাপর ধর্মে শ্রেষ্ঠ নীতিগুলোর এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ছিল।

অশোকের ধর্মনীতির সর্বজনীনত্ব ও উদারতা :

তাঁর ধর্ম আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা অধিকতর উদার ও মানবধর্মী ছিল। দাসদাসীদের প্রতি দয়াবান, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বিনয়ী ব্রাহ্মণ, জৈন ও শ্রমণদের প্রতি ভক্তিবান হতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে অশোক তাঁর ধর্মনীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 'পাপ যতই কম করা যায় ততই ভালো।'

পরধর্মসহিষ্ণুতা :

আত্মপরীক্ষা, মিতব্যয়িতা, সামান্য সঞ্চয়, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতির প্রয়োজন আছে একথা অশোক বলেছেন। এ জন্য তিনি পরধর্ম সম্পর্কে সমালোচনা না করা, অপরাপর ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রভৃতির নির্দেশ দিয়েছেন।

অশোকের ধর্ম প্রচার :

সম্রাটের পক্ষে ধর্ম প্রচারক হওয়া সহজসাধ্য নয়। কিন্তু মৌর্য সম্রাট অশোক ছিলেন রাজর্ষি। তার ধর্ম প্রচারে সামরিক শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন ছিল না। স্ত্রীলোকেরা অর্থহীন যে সকল মঙ্গলানুষ্ঠান করতেন সেগুলোর পরিবর্তে ধর্ম মঙ্গলের প্রবর্তন করা হয়েছিল। সকল শ্রেণির লোকের মধ্যে ধর্ম মহামাত্র

নামক এক শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য। অশোকের ধর্ম প্রচারের ফল তার ধর্ম প্রচার নীতির ফলেই ভারতীয় উপমহাদেশ বহুজাতির দেশ হওয়া সত্ত্বেও এক অপূর্ব মিলন তীর্থে পরিণত হয় এবং ভারতবর্ষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

শ্রদ্ধেয় নবীজির নাতী খলিফা হযরত আলীর পুত্র ইমাম হাসান :

ইমাম হাসানের বিপর্যয় : ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর ইমাম হাসান কুফাবাসীদের দ্বারা খলিফা নির্বাচিত হলে মক্কা ও মদিনার অধিবাসীগণ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু ধূর্ত কপট উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়া দুর্বলচিত্ত ইমাম হাসানকে খিলাফত থেকে বঞ্চিত করার অসৎ পরিকল্পনা করেন। মুয়াবিয়া কুফায় একদল সৈন্য প্রেরণ করলে এর গতিরোধের জন্য ইমাম হাসান কয়েসের নেতৃত্বে ১২,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কপট মুয়াবিয়া কায়েসের মৃত্যুর গুজব রটালে ইমাম হাসানের সৈন্যবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। চপলমতি কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইমাম হাসান ভগ্ন হৃদয়ে পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত :

যুদ্ধ বিপর্যয়ে ইমাম হাসান মুয়াবিয়ার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুয়াবিয়া খলিফা বলে স্বীকৃতি লাভ করবেন কিন্তু (১) তাঁর মৃত্যুর পর হযরত আলীর দ্বিতীয় পুত্র ইমাম হুসাইন খিলাফত লাভ করবেন। (২) মুয়াবিয়া খুতবায় হযরত আলীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ বন্ধ করতে স্বীকৃত হন। (৩) এ ছাড়া কুফার রাজকোষ থেকে এককালীন পঞ্চাশ লক্ষ দিরহাম (প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা) ইমাম হাসানকে পারিবারিক ভাতা হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। (৪) মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইমাম হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইমাম হোসেন খলিফা হবেন।

ইমাম হাসানের মৃত্যু :

সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করে ইমাম হাসান সপরিবারে মদিনায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়া দামেস্কে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করে উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইমাম হাসান মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদের প্ররোচনায় তাঁর স্ত্রী জায়েদা কর্তৃক বিষ প্রয়োগে নিহত হন। ইমাম হাসানের ভাগ্য বিপর্যয়ের অনেক কারণ ছিল। যেমন- মুয়াবিয়ার তুলনায় ইমাম হাসান সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনে পারদর্শী ছিলেন

না। তিনি ছিলেন সহজ সরল মানুষ। উপরন্তু ইমাম হাসান ষড়যন্ত্রকারী কুফাবাসীদের উপর নির্ভর করে মারাত্মক ভুল করেছিলেন।

ঐতিহাসিক কারবালার যুদ্ধ :

হযরত ইমাম হোসেন এবং উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদের মধ্যে সংঘটিত মর্মান্তিক কারবালার যুদ্ধের পশ্চাতে অনেক কারণ ছিল। প্রথমত: এই যুদ্ধের প্রথম কারণ মুয়াবিয়ার শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বশবর্তী হয়ে তার পুত্র ইয়াজিদকে অবৈধভাবে মনোনয়ন দান। দ্বিতীয়ত: মদিনার স্থলে দামেস্কে রাজধানী স্থাপিত হলে মৌলিক ইসলামি আদর্শের প্রাণকেন্দ্র মক্কা ও মদিনার প্রাধান্য লোপ পায়। এ কারণে মক্কা ও মদিনার অধিবাসীগণ ইমাম হোসেনকে সমর্থন করেন। তৃতীয়ত: ইমাম হোসেন ছিলেন খুব সরল প্রকৃতির। উমাইয়া বংশধরদের মত কুটিলতা, অসাধুতা ও ষড়যন্ত্রমূলক কৌশল জানতেন না। ইমাম হোসেন পিতার মত ছিলেন নির্ভীক, ন্যায়নিষ্ঠ ও উদার। চতুর্থত: বানার্ড লুই এর মতে জিয়াদ এবং বিশেষ করে তাঁর পুত্র ওবায়দুল্লাহর কুশাসনে ইরাকি আরবদের সিরিয়ায় আধিপত্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং ইমাম হোসেনের স্বপক্ষে আন্দোলন পরিচালিত করে মক্কা ও মদিনায় স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর ইয়াজিদের বিরোধিতা করে ইমাম হোসেনকে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে প্ররোচিত করেন। অবশ্য কুটিলমনা ও চক্রান্তকারী ইরাকিদের উপর নির্ভর করে ইমাম হোসেন মারাত্মক ভুল করেন। পঞ্চমত: কুফাবাসীদের সততা যাচাই-এর জন্য ইমাম হোসেন তাঁর চাচাত ভাই মুসলিমকে ইরাকে প্রেরণ করেন। কুফাবাসীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইমাম হোসেনের নিকট পত্র পাঠান। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে কুফাবাসী ইমাম হোসেনের পক্ষ ত্যাগ করে ইয়াজিদকে সমর্থন জানায় এবং কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক মুসলিম নিহত হন।

শান্তির প্রস্তাব :

ইমাম হোসেন মুসলিমের পত্রে কুফাবাসীদের সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কুফাবাসীদের চক্রান্ত ও মুসলিমের হত্যা সত্ত্বেও ইমাম হোসেন না বুঝেই কুফার সন্নিকটে উপনীত হলে তামীম গোত্রের লোকেরা তাঁকে বাধা দেয়। এতদসত্ত্বেও ইমাম হোসেন ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালায় তাঁবু ফেলেন। সেখানে তিনি প্রথমে ওমর ইবন সা'দ এবং ওবায়দুল্লাহ ইবন জিয়াদ কর্তৃক প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হন। রক্তপাত বন্ধের জন্য ইমাম হোসেন তিনটি প্রস্তাব দেন।

প্রথমত: তাঁর পরিবার-পরিজনসহ তাঁকে মদিনায় ফিরে যেতে দেওয়া হোক।
দ্বিতীয়ত: তাঁদেরকে তুর্কী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেওয়া হোক।
তৃতীয়ত: ইয়াজিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁকে দামেস্কে প্রেরণ করা হোক।

কিন্তু কুফার উমাইয়া শাসনকর্তা পাপিষ্ঠ ওবায়দুল্লাহ ইমাম হোসেনের শর্তাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। ফলে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরীর ৯ মহররম) কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেনের বাহিনীর সাথে ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। তুলনামূলকভাবে ইমাম হোসেনের দলে ছিল মাত্র কয়েকজন অনুচরবর্গ এবং কয়েকটি আরব গোত্রের সদস্যবৃন্দ। অপরদিকে ওবায়দুল্লাহ তার বিশাল বাহিনীসহ ফোরাত নদীর পাড়ে অবস্থান গ্রহণ করে ঈমাম হোসেন ও তার শিবিরে অবস্থানকারীদের অবরোধ করে পানি থেকে বঞ্চিত করে। ফলে পানির জন্য শিবিরে হাহাকার পরে। ইমাম হোসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র কাশেম প্রথমে পানি পিপাসার্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। এরপর ইমাম হোসেন তাঁর পুত্র আলী আসগরকে বুকে নিয়ে ফোরাত নদীতে পানি পান করতে গেলে আসগর শরবিদ্ধ হন। একটি রিতি ইমাম হোসেনের বক্ষ বিদীর্ণ করে বিবি সখিনাও মৃত্যু বরণ করে। নিষ্ঠুর ও পাপিষ্ঠ সীমার ইয়াজিদের নির্দেশে হোসেনের শিরশ্ছেদ করতে চাইলে ইমাম হোসেনের আবেদনে ঘাড়ের উপর তরবারি হেনে সীমার শিরশ্ছেদ করে। ইমাম হোসেন ১০ই মহররম কুচক্রী ইয়াজিদের দ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হন এবং তাঁর শাহাদত বরণের পর তার শিবিরে হাহাকার ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কারবালার প্রান্তরে নবী করীম (স:) এর দৌহিত্রের করুণ বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শোকের ছায়া ফেলেছিল। কারবালার যুদ্ধ প্রমাণ করে যে ইমাম হোসেন ন্যায়, সত্য, ধর্মনিষ্ঠার বেদীতে আত্মাহুতি দেন এবং অসত্যের নিকট মাথা নত করেননি। গিলমান বলেন, "ইমাম হোসেনকে শহিদের সম্মান প্রদান করা হয়"। ইয়াজিদ তিনটি দুষ্কর্মের জন্য কুখ্যাত।

১। কারবালার যুদ্ধে ইমাম হোসেনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা।
২। দ্বিতীয় বছরে পবিত্র মদিনা শহর লুণ্ঠন ও অপবিত্র করা।
৩। তৃতীয় বছরে মক্কা নগরীর হেরেম শরীফে অগ্নি সংযোগ এবং পবিত্র কৃষ্ণ পাথরের ক্ষতি সাধন।

ইসলামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক খন্দকের যুদ্ধ

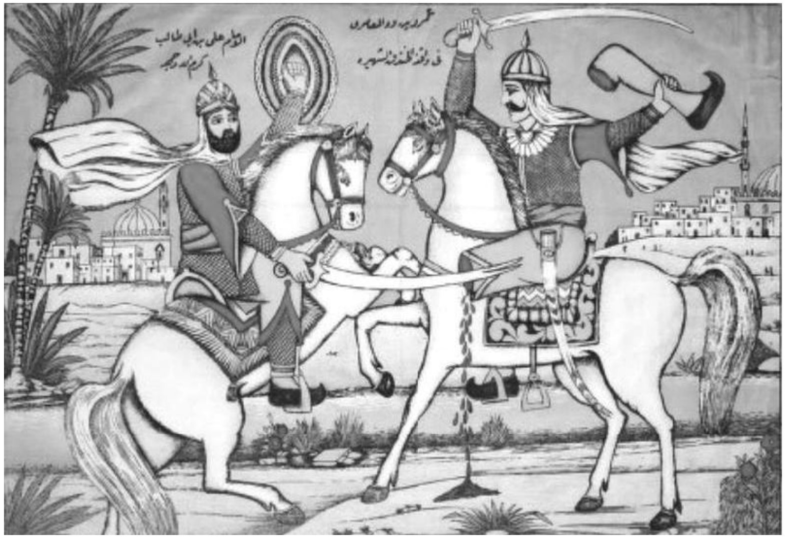

কারণ :

বেদুইনদের হঠকারিতা :

উহুদের যুদ্ধের বিপর্যয়ে মুসলমানগণ সংঘবদ্ধ হয়ে কুরাইশদের শত্রুতার মোকাবেলা করার দৃঢ় পরিকল্পনা করেন। উচ্ছৃঙ্খল বেদুঈনরা ইসলামের বিধি নিষেধ অমান্য করে অরাজকতা সৃষ্টি করতে থাকে। সুলাইম, ঘাতাকান, ফারায়া, আসাদ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব বেদুইন গোত্রগুলো কুরাইশদের সাহায্যে ৬,০০০ সৈন্য প্রেরণ করে।

ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা :

বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বানু কাইনুকা ও বানু নাজির গোত্রদ্বয়কে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। তারা স্বভাবত কুরাইশদের সাথে হাত মিলিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে। নেজ্‌দে ইসলাম প্রচার মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং মক্কার সাথে ইরাকের বাণিজ্য পথ বিচ্ছিন্ন করে কুরাইশদের ক্ষমতা হ্রাস করে।

ঘটনা : পরিখা খনন :

৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ কুরাইশ ইহুদি ও বেদুইনদের একটি সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্বদান করে আবু সুফিয়ান মদিনার দিকে অগ্রসর হলে হযরত ও পারস্যবাসী সালমান ফারসীর পরামর্শে শহরের চারিদিকে একটি পরিখা খনন করেন। পরিখা অথবা খন্দক থেকেই এ যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে "খন্দকের যুদ্ধ"। উদ্ভাবনী শক্তির প্রতীক ও আত্ম রক্ষার বলিষ্ঠ উপায় এ পরিখা কুরাইশদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও তারা উহুদের যুদ্ধের মত মুসলমানদের পর্যুদস্ত করতে পারেনি বেদুইন, কুরাইশ ও ইহুদিদের দ্বারা গঠিত ত্রিশক্তির মধ্যে ঐক্যের অভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মুসলমানদের ইস্পাত কঠিন সংকল্পের ফলে কুরাইশগণ পর্যুদস্ত হয়। ২৭ দিন অবরোধ করে রেখে কুরাইশরা মদিনা আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে।

ফলাফল :

উহুদ প্রান্তরের পরাজয়ের গ্লানিকে মুসলমানগণ পরিখার যুদ্ধে মোচন করতে সক্ষম হন। এর ফলে মুসলিম বিজয়ে কুরাইশ, বেদুইন ও ইহুদি ত্রি-শক্তির ক্ষমতা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইমামুদ্দীনের মতে "এ সম্মিলিত বাহিনীর (আহজাব) ভাঙ্গনের ফলে মক্কাবাসীদের সম্পূর্ণ পরাজয় প্রতিভাত হয়ে উঠে এবং তা মদিনার মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করে। ইসলাম অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবদেশ তথা পাশের দেশগুলোতেও বিস্তৃতি লাভ করে। খন্দকের যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের বিজয়ের যুদ্ধ।

মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের সাথে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীর যুদ্ধ

ঐতিহাসিক পানি পথের যুদ্ধ :

১৫২৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাবর পাঞ্জাব দখল করে দৌলত খানকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করলেন। জীর্ণ শীর্ণ আফগান সাম্রাজ্যের ভাগ্যাহত সুলতান ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান এবার আরম্ভ হলো। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল পানিপথের ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো দুই পক্ষের ভাগ্য পরীক্ষা। বাবরের ছিল মাত্র ১২০০০ সৈন্য আর বড় একদল গোলন্দাজ, ইব্রাহিমের দিকে ছিল এক লক্ষ যোদ্ধা। বাবর নিজে কৈশোর থেকে যুদ্ধ বিদ্যায় অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন; রণনীতি ও কৌশলে তিনি ছিলেন নিপুণ, আর তাঁর সঙ্গে ছিল যে কামান তা খুবই কাজ দিল। ইব্রাহীম লোদীর সম্বন্ধে বাবর মন্তব্য করেছেন, "বয়সে যুবা, ইব্রাহিমের যুদ্ধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল না, লড়াইয়ের মধ্যে নড়াচড়া ব্যাপারে তাঁর ছিল শৈথিল্য সৈন্যদলের কুচকাওয়াজে শৃঙ্খলা ছিল না। ভালো করে না ভেবেচিন্তে তিনি রণে ক্ষান্ত হচ্ছিলেন কিংবা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে যাচ্ছিলেন, যুদ্ধে লাগার সময় দূরদৃষ্টিও তাঁর ছিল না"। এমন অবস্থায় বাবরের বিজয় ছিল প্রায় পূর্ব নির্দিষ্ট। অপরাহ্নের পূর্বেই ইব্রাহীম লোদীর পরাজয় ঘটল। দিল্লী-আগ্রার ঐশ্বর্য অবিলম্বে বিজেতা বাবরের করায়ত্ত হলো। শোনা যায় যে ১০ মে তারিখে আগ্রায় ইব্রাহীমের প্রাসাদে বাবর যখন প্রবেশ করেন তখন পুত্র হুমায়ুনের কাছ থেকে তিনি প্রাসাদের কোষাগার থেকে একটি হীরক খণ্ড পান যার মূল্য ছিল "সারা দুনিয়া একদিনে যা খরচ করে তার অর্ধেক"– এটিই ছিল "কোহিনুর"। হিন্দুস্তানের বহুবিস্তৃত ঐশ্বর্য লুণ্ঠনের অংশ বাবরের সৈন্যদেরও দেওয়া হয়। কাবুলে বাবরের প্রজারাও একটি করে রৌপ্য মুদ্রা পায়। পানিপথের যুদ্ধ ভারত ক্ষেত্রে মুঘলের পরাক্রান্ত আবির্ভাব সূচিত করল। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের আভাসও সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সুলতানা রাজিয়া

সিংহাসনারোহণ :

ইলতুতমিশের জীবিত অবস্থায়ই তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বাংলাদেশের শাসনকর্তা নাসির উদ্দিন মাহমুদের মৃত্যু হয়েছিল। জীবিত পুত্রের অক্ষমতা দেখে ইলতুতমিশ ছেলের মৃত্যুর পূর্বেই স্বীয় কন্যা রাজিয়াকে দিল্লীর সিংহ াসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লী সাম্রাজ্যের অভিজাত শ্রেণি ও আমীর ওমরাগণ স্ত্রীলোকের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন এবং ইলতুতমিশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুত্র রুকনউদ্দিন ফিরোজকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন। ফলও ভালো হলো না। অকর্মণ্য ও ব্যভিচারী রুকনউদ্দিনের অধীনে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। এ চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে নিম্নবংশ সম্ভূতা তাঁর মাতা শাহ তুর্কান শাসন ক্ষমতা হস্তগত করলেন। কিন্তু সমগ্র দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করতে লাগল এবং রাজ্যের সর্বত্রই বিদ্রোহ দেখা দিল। এ বিশৃঙ্খলা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে বদায়ুন, হানসি, লাহোর, অযোধ্যা, বাংলাদেশ দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন উপেক্ষা করে স্বাধীন ভাবে চলতে লাগল। উপায়ান্তর না দেখে দিল্লীর অভিজাতবৃন্দ ও আমীর ওমরাহগণ কুখ্যাত রুকন উদ্দিন ও তাঁর রাণী মাতা শাহ তুর্কানকে কারাগারে বন্দী করলেন এবং ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়াকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন। রুকনউদ্দিন ফিরোজ ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ নভেম্বর কিলোঘরীতে বন্দী অবস্থায় মারা যান।

রাজিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ :

সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে সুলতানা রাজিয়াকে নানা বাধা-বিপত্তি, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ওয়াজির বা প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ জনাইদী এবং

অভিজাতবর্গের কয়েকজন রাজিয়ার শাসন সহজভাবে সরল মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁরা বিরোধিতার পথ অনুসরণ করলেন। কিন্তু প্রতিভা সম্পন্ন রাজিয়া দমবার পাত্রী ছিলেন না। তাঁর অদম্য সাহসের ফলে ও সুদক্ষ কুটকৌশলে তিনি বিরুদ্ধবাদী প্রধানমন্ত্রী জুনাইদী এবং অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তিকে দমন করে পরাস্ত করলেন। সুদূর বাংলা ও সিন্ধুর শাসনকর্তাগণও তাঁর প্রাধান্য ও প্রভুত্ব মেনে নিতে বাধ্য হলেন। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ হতে দেবল এবং দামরিলাহ পর্যন্ত যাবতীয় স্থানেই আমির ও মালিকগণ রাজিয়ার আনুগত্য স্বীকার করলেন।

আলতুনিয়ার বিদ্রোহ :

নুরউদ্দিন নামে জনৈক তুর্কীর নেতৃত্বে কিরামিতাহ ও মুলাহিদাহ্ নামে দুই মুসলিম সম্প্রদায় রাজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু তিনি শান্তিতে রাজত্ব করতে পারলেন না। জালাল উদ্দিন ইয়াকুত নামে জনৈক আবিসিনীয় বা হাবসী অনুচরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের ফলে তুর্কী অভিজাতগণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং সরহিন্দের শাসনকর্তা ইখতিয়ার উদ্দিন আলতুনিয়ার নেতৃত্বে রাজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। রাজিয়া সেনাবাহিনীসহ আলতুনিয়ার বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ধৃতা হলেন। ইয়াকুবও এ যুদ্ধে নিহত হলেন। বিজয়ী বিদ্রোহীগণ রাজিয়াকে বন্দী করে ইলতুতমিশের অপর এক পুত্র মইজ উদ্দিন বাহরামকে সুলতান বলে ঘোষণা করলেন এবং দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন।

রাজিয়ার মৃত্যু :

বন্দিনী অবস্থা হতে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে রাজিয়া বিজয়ী আলতুনিয়াকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু এ কূটকৌশল ব্যর্থ হলো। আলতুনিয়া ও রাজিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলে মুইজ উদ্দিন বাহরামের সেনাবাহিনীর হস্তে উভয়েই পরাজিত হলেন। এ দুঃসময়ে তাদের নিজ নিজ সৈন্যগণও তাঁদেরকে পরিত্যাগ করল। এমতাবস্থায় কাইথল নামক স্থানে রাজিয়া ও তার স্বামী আলতুনিয়া ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে হিন্দু আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন। এরূপ মর্মান্তিক ভাবে রাজিয়ার অল্পদিনের শাসনের অবসান ঘটল।

ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে সুলতানা রাজিয়াই ছিলেন একমাত্র নারী যিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। স্ত্রীলোকের শাসনের প্রতি এ সময়ের অভিজাতবর্গের বিরোধী মনোভাব শেষ পর্যন্ত রাজিয়ার ন্যায় বিদূষী সুলতানারও পতন ঘটিয়েছিল। ঈশ্বরী প্রসাদ যথার্থই বলেছেন যে, "স্ত্রীজাতি হওয়াই ছিল তাঁর প্রধান অযোগ্যতার স্বাক্ষর"। তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণ করে কোরান শরীফ পাঠ করতে পারতেন।

ঐতিহাসিক নাম নূরজাহান

জাহাঙ্গীর বাদশাহের সঙ্গে জগদ্বিখ্যাত রূপসী নূরজাহানের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন রয়েছে। এই দুইজনকে নিয়ে অজস্র কাহিনি প্রচলিত আছে। নূরজাহানের নাম প্রথমে ছিল মেহের উন্নিসা, পিতা মির্জা গিয়াস বেগ (পরে ইতিমদ-উদদৌলা) পারস্য থেকে এদেশে আসেন, পথে কান্দাহারে কন্যার জন্ম হয়। গিয়াস বেগ আকবর এবং জাহাঙ্গীরের আমলে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। আলিকুলি বেগ নামে যে পারসীক বর্ধমানের জায়গির এবং শের-আফগান উপাধি পেয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে মেহর-উন্নিসার বিবাহ হয়। জাহাঙ্গীরের কাছে শের-আফগানের বিদ্রোহী মনোভাবের সংবাদ আসায় তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য বাংলার নতুন শাসক কুতব-উদ্দীনকে পাঠানো হয়। কুতব-উদ্দীন খুন হয়ে যাওয়ায় অনুচরেরা শের আফগানের দেহ খণ্ডিত করে দেয় এবং মেহর উন্নিসাকে বাদশাহের জিম্মায় পাঠিয়ে দেয়। এর প্রায় চার বৎসর পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর মেহর্-উন্নিসাকে দেখে তার সৌন্দর্যে এমনই অভিভূত হন যে তাঁকে বিবাহ করে প্রধান মহিসীর স্থলে অভিষিক্ত করেন।

আনারকলির সঙ্গে তাঁর প্রেমের কাহিনি হলো সুবিদিত। জহাঙ্গীরের একটা নাম ছিল নূর-উদ্-দীন; তাই প্রথমে তিনি মেহর্-উন্নিসার নামকরণ করেন 'নূরমহল' (প্রাসাদের দীপ) পরে ঐ নাম বদলে করা হয় 'নূরজাহান' (জগতের আলো)। বিশ্বের সুন্দরী কুলে নূরজাহানের তুলনা বিরল। গ্রিক মহাকাব্যের হেলেন, আমাদের রামায়ন-মহাভারতে সীতা ও দ্রৌপদীর সৌন্দর্যখ্যাতি তদানীন্তন রাষ্ট্র সম্পর্কের উপর প্রখর ছায়াপাত করেছিল। নুরজাহানের সৌন্দর্য রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকায় অবলুপ্ত হয়ে যায়নি, রাষ্ট্র শাসনে স্বামীর সহযোগী হয়ে প্রভূত শক্তিরও তিনি পরিচয় দেন। স্বামীর উপর তার

দারুণ প্রভাব ছিল। পিতা ইতিমদ-উদ্-দৌলা (যাঁর কবর আগ্রায় দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে খুবই স্মরণীয়) এবং ভ্রাতা আসফ খানকে তিনি বাদশাহের সভায় সমুচ্চ পদে বসিয়ে দেন। স্বামীর সঙ্গে শিকারে তিনি যেতেন প্রচণ্ড সাহসের পরিচয় দিয়ে স্বহস্তে অনেক বাঘ পর্যন্ত মেরেছিলেন। বিশেষত, আফগান মহবৎ খান-এর হাতে জাহাঙ্গীর যখন নিঃসহায় অবস্থায় ধরা পড়েছিলেন, তখন নূরজাহানের সাহস, কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরেই বাদশাহকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। জাহাঙ্গীরের মুদ্রাতে নূরজাহানের মূর্তি স্থাপন-মুসলিম জগতের ইতিহাসে এরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর নেই। জাহাঙ্গীরের প্রতি তাঁর প্রেমও ছিল অনাবিল। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর প্রায় আঠারো বৎসর নূরজাহান বেঁচে ছিলেন, কিন্তু সকল প্রকার বিলাস ব্যাসন পরিত্যাগ করে স্বামীর স্মৃতির প্রতি বিশ্বস্ত জীবন যাপন করেন। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পর লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধি পার্শ্বেই তার কবর হয়। রূপ ও গুণের অপূর্ব সমাবেশে ইতিহাসে নূরজাহান অম্লান হয়ে রয়েছেন।

বিদ্যোৎসাহী সুলতান মাহমুদ

সুলতান মাহমুদ নিজে অশিক্ষিত ছিলেন কিন্তু তিনি শিক্ষিত লোকের মর্যাদা দিতেন। তার দরবারে অনেক কবি সাহিত্যিকদের কদর ছিল আদর ছিল। উনসুরী ছিলেন তার সভা- কবি এবং উতবী ছিলেন দরবারের ঐতিহাসিক। তবে কবিদের মধ্যে মহাকবি ফেরদৌসি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন। মাহমুদের আদেশে তিনি বিখ্যাত শাহনামা কাব্য রচনা করেন। মাহমুদ তাঁকে ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু তাঁর আজ্ঞাবাহী আয়াজের কুপরামর্শে ফেরদৌসিকে ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বদলে রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করেন। এতে ফেরদৌসি মনের দুঃখে সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেন এবং গজনী ত্যাগ করে স্বদেশে রওয়ানা হন। ব্যঙ্গ কবিতা শুনে পরে মাহমুদ ভুল বুঝতে পারেন এবং ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ফেরদৌসির নিকট পাঠিয়ে দেন, কিন্তু তা পৌছুবার পূর্বেই ফেরদৌসির মৃত্যু হয়। কবি হিসেবে তৎকালে ফেরদৌসি জগৎ বিখ্যাত ছিলেন। শাহনামা তার অমর কাব্যগ্রন্থ বিশ্বনন্দিত।

সম্রাট শাহ্জাহানের নির্মিত কালজয়ী তাজমহল

শাহ্জাহানের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপারে আগ্রহ ছিল, ফারসি ও হিন্দিতে তিনি কথা বলতে পারতেন, তুর্কী ভাষাতে তো বটেই। দারা ছাড়া অন্য ছেলেদের হাতে বহু কষ্ট ভোগ তিনি করেছিলেন। কিন্তু নিজের সন্তানদের প্রতি তাঁর হৃদয়ে প্রকৃত সম্রাজ্ঞীর মতো অধিকার করেছিলেন। ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের উনিশ বৎসরের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। শাহ্জাহান তার পরে পঁয়ত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু মমতাজের স্মৃতি তাঁর মনে অক্ষয় হয়েছিল, আর সেই স্মৃতিকে কালজয়ী করার উদ্দেশ্যে নির্মিত তাজমহল আজও বিশ্বজনের চিত্তজয় করেছে –

“এক বিন্দু নয়নের জল,
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল,
এ তাজমহল।”

এ তাজমহল নির্মাণ করতে ২০ হাজার শ্রমিকের ২২ বৎসর সময় লেগেছে। শাহ্জাহানের প্রচেষ্টা আর উস্তাদ ইসার নির্দেশনাও নিপুণতার কারুকার্য খচিত এ তাজমহল শ্রমিকরা নির্মাণ করেন। শাহ্জাহানের রাজত্বকাল মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগ বলে কথিত হয়েছে। সিংহাসন নিয়ে শাহ্জাদাদের লড়াই বাধার আগে পর্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন প্রায় নিরঙ্কুশভাবেই চলেছিল। ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতবর্ষের সম্পদ দেখে ঈর্ষান্বিত ও লোভাতুর হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য তখন এগিয়ে চলছিল। সম্রাটের ধনভাণ্ডার তখন পরিপূর্ণ। তাই আগ্রার ঐতিহাসিক তাজমহল যা মধ্যযুগের সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য আর মোতি মসজিদ, দিল্লীর দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি কিংবা বিশ্ববিশ্রুত ময়ূর সিংহাসনের মতো অপরূপ কারুকর্মের নিদর্শন তদানীন্তন ভারত সংস্কৃতির ঐশ্বর্য ও গৌরবের সাক্ষ্য বহন করে এসেছে। শাহ্জাহানের নির্মিত ময়ূর সিংহাসন নাদীর শাহ্ ফ্রান্সে নিয়ে গেছে। অম্লান স্থাপনার জন্য শাহ্জাহান ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

ঈসা খান মানসিংহ যুদ্ধ

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে যেসব স্বাধীন জমিদার মুঘল শাসনকে ধিক্কার জানিয়ে স্বাধীনভাবে স্ব স্ব এলাকা শাসন করেন তাদের বার ভূঁইয়া বলা হয়। এ বার ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসাখান। "বারো" ভূঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিখ্যাত হলেন ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঈসা খান।

মানসিংহ :

বহু গুণান্বিত মানসিংহ মুঘল সম্রাট আকবরের কটুম্ব আত্মীয় হয়ে যুদ্ধে এবং শাসনকার্যে মুঘল সাম্রাজ্যের সহায় এবং সেবকরূপে কাজ করতে থাকেন? আকবর যাঁদের সর্বোচ্চ কাজে নিযুক্ত করেন তাদের মধ্যে মানসিংহই হলো শ্রেষ্ঠ। আকবরের নির্দেশে মানসিংহ ষোড়শত শতাব্দীর শেষের দিকে ঈসাখানের সাথে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ঈসাখানও মানসিংহের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুত হন। এক সময় কিশোরগঞ্জের এগার সিন্ধুর ময়দানে ঈসাখান ও মানসিংহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধ করতে করতে মানসিংহের তরবারি এক পর্যায়ে ভেঙে যায়। তখন ঈসা খান তাকে নিজের তরবারি দেন কিছুক্ষণ পর দুইজনের মধ্যে মল্ল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মানসিংহ হেরে যায়। ঈসাখান বিজয়ী হন। কিন্তু মানসিংহের সাথে ঈসাখান আকবরের দরবার কক্ষে হাজির হন। তিনি আকবরকে বলেন, 'আমি যুদ্ধে মানসিংহের সাথে পরাজিত হয়েছি' এ কথা বলার সাথে সাথে মানসিংহের স্ত্রী সাক্ষী দেন আকবরকে বলেন যুদ্ধে মানসিংহ পরাজিত হয়েছে। এ কথা বলার সাথে সাথে আকবর রাগান্বিত হয়ে মানসিংহকে শাস্তি দিবার জন্য উদ্ধত হলে ঈসাখান মানসিংহের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অবশেষে আকবর ক্ষমা করে দেন। পরে অবশেষে ঈসাখান জঙ্গলবাড়ি নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। তিনি জঙ্গলবাড়িতে একটি পরিখা খনন করেন। আমি (লেখক) জঙ্গলবাড়ি ঈসাখানের বাড়ি গিয়ে ছিলাম এগার সিন্ধুর মাঠও দেখেছি। এই ভাবে ইসাখান বীর যোদ্ধা হিসেবে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি সোনার গায়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট আকবর ২২ পরগণার শাসক নিয়োগ করেন ও মসনদ-ই আলা উপাধিতে ভূষিত করে তার নিজ গৃহে ফেরত পাঠান।

বাংলার বজ্রকণ্ঠ

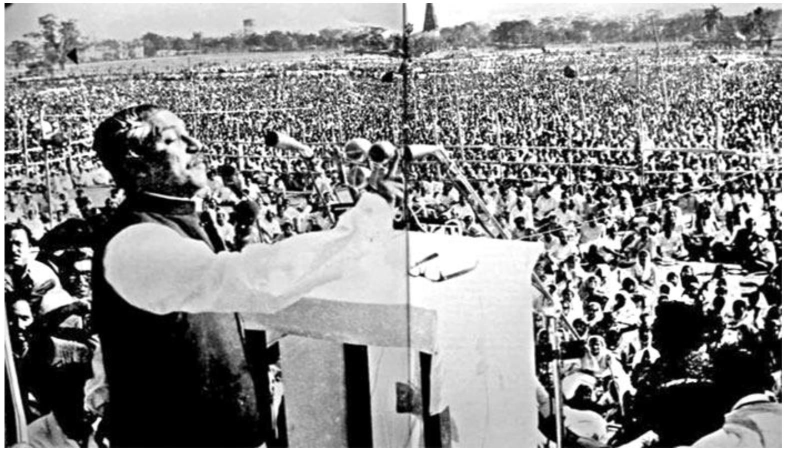

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলার রক্তে ভেসে বাংলা বিহার উরিষ্যা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চলে যায় ইংরেজদের কবলে। দুইশত বৎসর এ দেশ শাসন শোষণ নির্যাতন করে বৃটিশ সরকার। ফাঁসিকাষ্ঠে ফাঁসির দড়িতে কামানের গুলিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ জীবন দানের বি নিময়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৪ আগস্ট পাক-ভারত উপমহাদেশ স্বাধীনতা পায়। কিন্তু পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। বিগত ২৫ বৎসর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে শাসন, শোষণ নির্যাতন করে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন কথা বলেন, বক্তব্য দেন কারাবরণ করেন শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বাংলার মহান অধিপতি বাংলার বীর সিপাহশালার, বাংলার স্থপতি বাংলার বজ্র কণ্ঠ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমান। তিনি পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলতে প্রতিবাদ করতে যেয়ে জীবনের ১৪টি বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করেন। তিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অগ্নিশর্মা অগ্নিঝরা বক্তব্য দেন এবং বাংলার স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি বলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি তখন রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" তার বজ্রকণ্ঠের আহ্বানে বাংলার মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পরে। মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় মিত্র

বাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের দামে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের উন্নয়নের পতাকা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে রাস্তা ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, শিক্ষা ভাতা, প্রস্তুতি ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, ওভার ব্রিজ, ফ্লাই ওভার, চিকিৎসা সেবা, আর্তমানবতার সেবা, গুচ্ছগ্রাম, মেট্রোরেল, করোনার টিকা, করোনা মোকাবেলা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, খেলাধুলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মীয় উন্নয়ন, মসজিদ, মাদ্রাসা, মিল-কারখানা, বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়ন, রোহিঙ্গা আশ্রয়, স্কুল কলেজ উন্নয়ন, সর্বোপরি গর্বের পদ্মা সেতু আমাদের অহংকার। জয় বাংলা।

৭১ এর রণাঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের ভাষণ শুনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মীর্জা শামছুল আলম।

ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ

মদিনায় ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে মক্কার কুরাইশগণ শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। ইসলামি প্রজাতন্ত্র গঠন ও মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারে বিধর্মীরা ইসলাম ধর্ম ও মদিনাবাসীদের নিশ্চিহ্ন করার দৃঢ় সংকল্প করে। ইসলামের সাথে বিধর্মীদের প্রথম উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ হয় ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদরের প্রান্তরে।

কারণ :

বিভিন্ন কারণে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

কুরাইশদের শত্রুতা :

বদরের যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মদিনায় ইসলামের ক্ষমতা ও প্রভূত্ব বৃদ্ধি। মাত্র দু' বছরে হযরত মুহাম্মদ (স.) কলহে লিপ্ত মদিনাবাসীদের একটি জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও ইসলামকে আন্তর্জাতিকীকরণ করার প্রচেষ্টায় মক্কার বিধর্মী কুরাইশগণ ঈর্ষান্বিত হয়। জন্মভূমি মক্কা হতে হযরতকে বিতাড়িত করে তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং তাঁকে ও নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

আবদুল্লাহ-বিন-উবাই-এর ষড়যন্ত্র :

হযরত (স.) এর অসামান্য প্রাধান্য খর্ব করার জন্য বানু খাযরাজ বংশীয় আবদুল্লা-বিন- উবাই নামক একজন প্রতিপত্তিশালী পৌত্তলিক গোপনে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। হিজরতের পূর্বে মদিনায় তার শাসকরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইসলামি প্রজাতন্ত্র কায়েম ও মদিনা সনদের পরিপ্রেক্ষিতে তার আশা পূর্ণ হয়নি। এর ফরে সে

মক্কার বিধর্মীদের সাথে দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপে নিয়োজিত হয় এবং মদিনায় হযরত (স.) এর বিরুদ্ধে প্রচারণা ও বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা একটি মোনাফেক দল গঠন করে।

ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা :

পাপিষ্ঠ মোনাফেক দলের সাথে বিশ্বাসঘাতক ইহুদিরা সংঘবদ্ধ হয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.) তথা ইসলামের ধ্বংস সাধনের জন্য তীব্র ষড়যন্ত্র শুরু করে। ধর্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা প্রদান সত্ত্বেও ইহুদিগণ কোনো দিনই মুসলমানদের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব প্রকাশ করেনি। আমীর আলী যথার্থই মন্তব্য করেন, "সমগ্র মদিনা বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতায় ভরে গিয়েছিল।"

অর্থনৈতিক কারণ :

মক্কা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথে মদিনা অবস্থিত ছিল। মদিনায় হযরতের নিয়ন্ত্রণাধীনে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে কুরাইশগণ নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ হারাতে পারে এ আশঙ্কায় তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ব্যবসা ও তীর্থযাত্রা বন্ধ হলে কুরাইশগণ সমূহ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে উপলব্ধি করে ইসলামের মূলোৎপাটনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

দস্যুবৃত্তি ও লুটতরাজ :

মক্কা নগরীর পবিত্র কাবা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় সমগ্র আরবে পৌত্তলিকদের মধ্যে কুরাইশদের অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মক্কা ও মদিনার বাণিজ্য পথে বসবাসকারী বিভিন্ন আরব গোত্র কুরাইশদের আনুগত্য স্বীকার করে হযরতের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এর ফলে মদিনার মুসলমানগণ প্রমাদে পড়ে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতা যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। মদিনার সীমান্তবর্তী এলাকায় বিধর্মী কুরাইশগণ মুসলমানদের শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দিত ফলবান বৃক্ষ ধ্বংস করত এবং উট ও ছাগল অপহরণ করত।

নাখলার খণ্ড যুদ্ধ :

হিট্টি অভিমত প্রকাশ করেন পবিত্র রমজান মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হলেও মদিনার মুসলমানগণ হযরতের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে মক্কা গমনকারী একটি কাফেলাকে আক্রমণ করেন। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, কুরাইশদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণ ও লুটতরাজ বন্ধ করার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহশের নেতৃত্বে ১২ জনের একটি গোয়েন্দা দল দক্ষিণ আরবে প্রেরণ করেন। কিন্তু কাফেলা আক্রমণ করতে আদেশ করেননি। কিন্তু আবদুল্লাহ ভুলক্রমে চারজন যাত্রীর মক্কার একটি কাফেলা আক্রমণ করলে নাখলায় একটি খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর ফলে কুরাইশ নেতা আমর নিহত ও অপর দু'জন বন্দী হয়। এরূপ অদূরদর্শী কার্যের জন্য হযরত

আবদুল্লাহকে তিরস্কার করেন। ভুলক্রমে পবিত্র রমজান মাসে খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলে একটি আয়াতও নাজিল হয়েছিল নাখলার খণ্ড যুদ্ধকে বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়।

আবু সুফিয়ানের প্ররোচনা :

ইসলামের চিরশত্রু আবু সুফিয়ান অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বাণিজ্যের অজুহাতে এক কাফেলা নিয়ে সিরিয়া গিয়েছিলেন। গাজা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী এ কাফেলায় প্রায় ৫০,০০০ দিনার মূল্যের ধন-রত্নাদি ছিল। নাখলার যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে কুরাইশগণ মক্কায় কাফেলার নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। জনরব উঠল যে আবু সুফিয়ানের কাফেলা মদিনার মুসলমান অধিবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এই গুজবের সত্যতা যাচাই না করে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করে আবু জেহেল ১০০০ সৈন্য নিয়ে আবু সুফিয়ানের সাহায্যার্থে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

প্রকৃত ঘটনা :

ঐশীবাণী :

কুরাইশদের যুদ্ধাভিযানে হযরত খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তিনি ঐশীবাণী লাভ করে অনুপ্রাণিত হলেন: "আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমার সাথে যুদ্ধ করে। তবে সীমা লঙ্ঘন করো না, কারণ আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না"। যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রণা-সভার পরামর্শক্রমে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ (১৭ রমজান ২য় হিজরী) তারিখে আনসার এবং মোহাজের নিয়ে গঠিত মাত্র ৩১৩ জনের একটি মুসলিম বাহিনী কুরাইশ বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য প্রেরিত হয়।

সংঘর্ষ :

মদিনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদরের উপত্যকায় মুসলিম বাহিনীর সাথে বিধর্মী কুরাইশদের সংঘর্ষ হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করে অনুপ্রেরণা দান করেন। আল-আরিসা পাহাড়ের পাদদেশে মুসলিম শিবির স্থাপিত হয় এবং এর ফলে পানির কূপগুলো তাদের তত্ত্বাবধানে আসে। প্রথমে প্রাচীন আরব রেওয়াজ অনুসারে মল্লযুদ্ধ হয়। মহানবীর নির্দেশে হযরত আমির হামজা, হযরত আলী ও আবু উবায়দা কুরাইশ পক্ষের নেতা উতবা, শায়বা এবং ওয়ালিদ-বিন-উতবার সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতে শত্রুপক্ষীয় নেতৃবৃন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হয়। উপায়ান্তর না দেখে আবু জেহেল বিধর্মী বাহিনীসহ মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মুসলমানদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করতে লাগল। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করা কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মুসলিম বিজয় :

অসামান্য রণ-নৈপুণ্য, অপূর্ব বিক্রম ও অপরিসীম নিয়মানুবর্তিতার সাথে যুদ্ধ করে মুসলমানগণ বদরের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে বিধর্মী কুরাইশদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এ যুদ্ধে ৭০ জন কুরাইশ সৈন্য নিহত হয় ও সমসংখ্যক সৈন্য বন্দী হয়। অপরদিকে মাত্র ১৪ জন মুসলিম সৈন্য শাহাদৎ বরণ করেন। আবু জেহেল এ যুদ্ধে নিহত হয়।

বন্দীদের প্রতি উদারতা :

যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি উদার ও মধুর ব্যবহার হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মহানুভবতার পরিচায়ক। তিনি নির্দেশ দেন যে যুদ্ধ বন্দীদের প্রয়োজন মত আহার, বস্ত্র বাসস্থান প্রদান করতে হবে। মুক্তিপণ গ্রহণ করে কুরাইশ বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করা হয়। মাত্র ৪০০০ দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারিত হয়। যারা মুক্তিপণ দিতে অক্ষম তারা মুসলমানদের বিরোধিতা না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে ও মুসলমান বালকদের শিক্ষাদান করার অঙ্গীকার করে মুক্তি লাভ করে।

বদরের যুদ্ধের গুরুত্ব :

যোসেফ হেল বলেন, "বদরের যুদ্ধ ইসলামের প্রথম সামরিক বিজয়। এটি অবিসংবাদিত সত্য যে বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগসন্ধিক্ষণকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিশাল কুরাইস বাহিনী স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সৈন্যের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে বিধর্মীগণ নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে।

বিশ্ববিজয় :

হিট্টির মতে, "এই সশস্ত্র সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমানগণ যে নিয়মানুবর্তিতা ও মৃত্যুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এতে ইসলামের পরবর্তী বিজয়ের বিশেষ লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বদরের যুদ্ধে মুসলিম বিজয় ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সম্প্রসারণের সূচনা করে এবং পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে ইসলাম পশ্চিমে আফ্রিকা থেকে পূর্বে ভারতবর্ষ ও মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

জেহাদ :

মক্কার প্রায় এক সহস্র বীর সেনার বিরুদ্ধে মাত্র তিনশত মুসলমানের যুদ্ধাভিযান যে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংঘর্ষ তা নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে। বদরের যুদ্ধ শুধু মুষ্টিমেয় মুসলমানের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুপ্রেরণা প্রদান করে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে "আল্লাহ স্বয়ং তাদের সাহায্যকারী।"

ইসলাম প্রচার :

বদরের যুদ্ধ বিজয় ইসলাম প্রচারে নব-দিগন্তের সূচনা করে। নিকলসন বলেন, "ম্যারাথনের ন্যায় বদর যুদ্ধ ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় যুদ্ধের অন্যতম"। যোসেফহেল বলেন, "বিধর্মী আরবদের অধিকাংশই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করল"। এ যুদ্ধ হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতেও যথেষ্ট সহায়তা করেছে। বদরের যুদ্ধের মহা বিজয় ইসলামকে কেবল আরবেই নয় অনারব অঞ্চলেও সর্বজনীন করে তোলে।

ইসলামি রাষ্ট্রগঠন :

বদরের যুদ্ধ ইসলামকে মদিনা প্রজাতন্ত্রের ধর্ম হতে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রের ধর্মে উন্নীত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং একে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত করে। হযরত মোহাম্মদ (স.) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিজয়ীর বেশে মদিনা ফিরে এসে পরাক্রমশালী যোদ্ধা, সুদক্ষ সমর নায়ক ও সুবিবেচক শাসকের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেন। ইসলাম তার প্রথম ও চূড়ান্ত সামরিক বিজয় লাভ করল। হযরত মুহাম্মদ (স.) যে শুধু আধ্যাত্মিক সুপ্তিতেই অবচেতন নন পার্থিব ঘটনাবলি বিচারেও তিনি যে একজন যোগ্য ও জনপ্রিয় নেতা এটাই প্রমাণিত হলো। তিনি একাধারে নবী ও রাষ্ট্র পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বিধর্মীদের আশঙ্কা :

মুসলমানদের বদর বিজয় ইসলামের অপরাজেয় শক্তির পরিচায়ক। এর ফলে ইহুদি এবং খ্রিস্টানগণ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। হিট্টি বলেন, "ইসলাম পুনজীবন লাভ করল এবং আত্মরক্ষার পরিবর্তে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করল"। প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার ও আচার অনুষ্ঠান পালন, রাষ্ট্রীয় কার্য তত্ত্বাবধান যুদ্ধ বিগ্রহ পরিচালনা দূত প্রেরণ দ্বারা বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং সমরাভিযান দ্বারা ইসলামি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ নীতিতে বিধর্মীদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। সুতরাং বদরের যুদ্ধকে ইসলামের ইতিহাসে একটি আলোড়নকারী ঐতিহাসিক ঘটনা বলা যেতে পারে।

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর বিদায় হজের ভাষণ

পবিত্র হজ পালন শেষে ৮ জিলহজ মহানবী (স.) মক্কা পরিত্যাগ করে মদীনার পথে যাত্রা করলেন। সেখানে রাত্রিবাস করে পরদিন ভোরে ফজরের নামাজের পর তার আলকাসোয়ায় সওয়ার হয়ে শিষ্যদের নিয়ে আরাফাত ময়দানের দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে আরাফাত পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বিশ্ব মুসলিমের উদ্দেশ্যে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর জীব নের সর্বশেষ ভাষণ দান করলেন। বললেন, "হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, মনে রেখো, সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই- কেউ কারো চেয়ে ছোট বা কেউ কারো চেয়ে বড় নয়। একদিন আল্লাহ্‌তা'লার কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।

* নারীদের ওপর অত্যাচার করো না, নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও তেমনি অধিকার আছে। মনে রেখো, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গ্রহণ করেছ।

* দাস-দাসীদের ওপর অত্যাচার করো না, বরং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে- তোমরা যা খাবে তাদের তাই খেতে দেবে, তোমরা যা পরবে তাদেরও তাই পরতে দেবে। মনে রেখো, তারা তোমাদেরই মত মানুষ।

* মনে রেখো, সুদ ঘুষ খাওয়া হারাম, হত্যা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ, বংশের বড়াই সর্বনাশের কারণ। সাবধান, নেতাকে অমান্য করো না। একজন ক্রীতদাস নেতা হলেও নীরবে তাঁর আদেশ পালন করো।

* সাবধান, পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হয়ো না, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কারো অংশী স্থাপন করো না। চুরি করো না, ব্যভিচার করো না, মিথ্যা কথা বলো না-চিরদিন সত্যাশ্রয়ী হয়ে পবিত্র জীবন যাপন করো।

* আর ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না, এই বাড়াবাড়ির ফলে অতীতে বহুজাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

* মনে রেখো আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না।

আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ (কোরআন) আর আমার সুন্নত (অর্থাৎ নিয়ম বা হাদীস) রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ গ্রন্থকে অনুসরণ করবে, আমার সুন্নতকে অনুসরণ করবে, ততদিন কেউ তোমাদের ধ্বংস করতে পারবে না। মনে রেখো, একদিন তোমাদের আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে সেদিন তোমাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

আজ এখানে যারা উপস্থিত নেই, আমার বাণীকে তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ো"। ভাষণ শেষে মহানবী মুহম্মদ (স.) নীরব হলেন, তাঁর মুখমণ্ডল জ্যোতিদীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি ঊর্ধ্বগগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে করুণ গম্ভীর আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, "হে আমার আল্লাহ্ হে আমার প্রভূ আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিতে পারলাম?" সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ভক্তকণ্ঠে নিনাদিত হলো, "নিশ্চয়, নিশ্চয়"। মহানবী মুহম্মদ (স.) তখন কাতর কণ্ঠে বললেন "প্রভূ! সাক্ষী থাকো–এরা বলছে, আমি আমার কতর্ব্য পালন করেছি।" সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লা অহী মারফৎ জানালেন, "(হে মুহম্মদ) আজ আমি তোমাদের ধর্মকে সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার করুণা (নেয়ামত) পূর্ণ করে দিলাম, ইসলামকেই তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম। ৫ (৩) স্বর্গমর্ত্যের সুর-সৌরভে ভরা সেই আশ্চর্য অভিভাষণের পর মানুষের নবী সেই বিশাল জনসমুদ্রকে সম্ভাষণ করে বললেন বিদায়, বন্ধুগণ বিদায়।"

--- ০ --লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

লেখকের ছবি সংযুক্ত হবে

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মীর্জা শামছুল আলম এ্যাডভোকেট, তিনি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার মেদী আশোই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মীর্জা মো. মহিদুর রহমান, মাতা শামছুন্নাহার। চার ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ। ছোটবেলা থেকেই তিনি শান্ত স্বভাবের এবং খেলাধুলা, লেখালেখি করতে পছন্দ করতেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মেদী আশুলাই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাস করেন। এরপর বড়ইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে কালিয়াকৈর কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া থেকে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন করিমগঞ্জ (কিশোরগঞ্জ জেলা) কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। দীর্ঘকাল মির্জাপুর টাঙ্গাইল ডিগ্রি কলেজে অধ্যাপনার পর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে অবসরে যান। কিন্তু বর্তমানে তিনি গাজীপুর এবং টাঙ্গাইল কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিতার্কিক। তিনি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে দীর্ঘদিন বাংলার ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। জাতীয় বির্তক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন। সর্বজনবিধিত তিনি একজন সু-বক্তা। ইতিহাস কথা কয় টিভি অনুষ্ঠানে তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দুইবার সাক্ষাৎ দান করেন। ১৯৭৯-১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে করটিয়া সরকারি সা'দত কলেজের ছাত্র সংসদের জি.এস ছিলেন। তিনি গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সহ-সভাপতি ও মির্জাপুর কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক সচেতন মানুষ। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে এমপি পদে নির্বাচন করেন। তিনি জীবনে অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। "বন্দি খাঁচার বুলি" তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ "আমার মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো", তৃতীয় গ্রন্থ "দৃপ্ত যৌবন সৃষ্টির ইতিহাস"। পারিবারিক জীবনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (বি এস এস সম্মান এম এস এস) নাজমা সুলতানা ঝর্ণার সাথে। সহ-ধর্মিণী কালিয়াকৈর থানার নামাশোলাই গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। সুখময় সংসারে ছেলে মীর্জা রহমান সামজিদ উদ্ভাস বিএ সম্মান। মেয়ে এম বি এ মীর্জা শামীমা সুলতানা তানজিল। সকল মানব জীবন সুন্দর হউক। আল্লাহ হাফেজ।

কভারে যাবে

কৃতজ্ঞতার আলোকে লেখকের স্বল্প কথা

"দৃপ্ত যৌবন সৃষ্টির ইতিহাস" দীর্ঘদিন প্রচেষ্টার পর আমি এই তথ্যমূলক ঐতিহাসিক বইটি লিখেছি। এই বইটিতে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা যুদ্ধ বিগ্রহ বিদ্রোহের ঘটনা শোক দুঃখের ঘটনা বিভিন্ন ঐতিহাসিক বীর যোদ্ধা ও ব্যক্তিদের সমন্বয় ঘটেছে। জীবন মৃত্যুর নিরব স্বাক্ষী এই বইটি। বইটি আমি লিখেছি আমার নিজ বর্তমান বাসস্থান প্রফেসর পাড়া টাঙ্গাইল মির্জাপুরে বসে। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় দয়া মায়ায় ভরা প্রফেসর পাড়া মাস্টার পাড়া মহল্লা। টাঙ্গাইল এর "ছায়ানীড়" একটি সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রতিভার বিকাশ ঘটে, প্রতিভার সমন্বয় সাধন করে। কবি সাহিত্যিকদের মিলনের কেন্দ্রস্থান নাম তার "ছায়ানীড়" পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা, মায়া মমতার বন্ধন স্থাপন করে "ছায়ানীড়" প্রকাশনা। প্রতি পরম শ্রদ্ধেয় পাঠক পাঠিকাবৃন্দ আপনারা আন্তরিকভাবে আমার লেখা তিনটি বই যথাক্রমে-

১। আমার মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো।

২। বন্দি খাঁচার বুলি।

৩। দৃপ্ত যৌবন সৃষ্টির ইতিহাস।

এই বইগুলো দয়া করে সংগ্রহ করবেন, পড়বেন, পড়লে জ্ঞানের পরিধি বাড়বে মনের খোরাক যোগাবে। ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। বই লিখতে যেয়ে যে সকল মূল্যবান বইয়ের সাহায্য নিয়েছি, সেই সকল বইয়ের লেখক ও বইয়ের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের প্রতি মির্জাপুর বাজারের কলেজ লাইব্রেরির মো. আলমাসুম কবীর (আলমাস), জুগীর কুফা গ্রামের হীরা মল্লিক, যুগী গ্রামের মজনু, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল ও আমার স্নেহের নাতী আনাছ, মিহছান, রাফান এদের প্রতি আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ্ হাফেজ। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হউক।